১ম বর্ষ
শ্রাবণ, ১৩৩৮

প্রবর্ত্তক—কবিরাজ শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থ

২য় সংখ্যা।
July, 1931

আয়ুর্ব্বিজ্ঞান সম্মিলনী

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক মাসিক

সম্পাদক—কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন

সহঃসম্পাদক—কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী

[illegible]ক ২৸৹]   কার্য্যালয়:—২০ নং বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা   [প্রতি সংখ্যা ৶১০

সবিনয় নিবেদন,—

আপনাকে আয়ুর্ব্বেদের চিরহিতৈষী বন্ধু জানিয়া "আয়ুর্ব্বিজ্ঞান সম্মিলনী"র এই সংখ্যা প্রেরণ করিলাম। অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই সংখ্যা পাইয়া ইহার বার্ষিক সংখ্যা ২॥৵০ মণিঅর্ডারে পাঠাইয়া দিলে বিশেষ বাধিত হইব। বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতা হইতে আয়ুর্ব্বেদের পত্রিকা একখানিও নাই, এ অবস্থায় এরূপ একটি সদনুষ্ঠানে আমি সকলের নিকট হইতেই উৎসাহ পাইবার আশা রাখিতে পারি।

সনাতন আয়ুর্ব্বেদের গবেষণা সকল প্রকাশ করিয়া জনসাধারণকে স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘজীবি করিবার উপায়-বিধি তো ইহাতে থাকিবেই, তদ্ভিন্ন এলোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ ও হাকিমদিগের গবেষণা সকলও ইহাতে নিয়মিত বাহির হইবে, এজন্য এই পত্রিকাখানি চিকিৎসক, অচিকিৎসক—সকলের পক্ষেই অবশ্য প্রয়োজনীয়। আমি ভরসা করি, আপনি আমাদের এরূপ একটি মহদুদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে সর্ব্ব প্রকারে সাহায্য করিতে ত্রুটি করিবেন না।

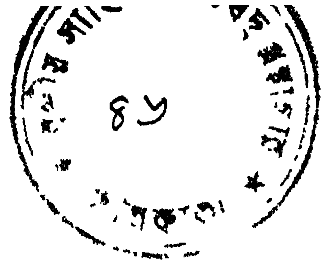
যদি মণিঅর্ডারে মূল্য প্রেরণ না করিয়া ভিঃ পিঃ করিতে আদেশ করেন, তাহা হইলে আপনার পত্র পাইলে পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃ করিব। ভিঃ পিঃতে ৵০ বেশী লাগিবে।

সত্বর আপনার সহানুভূতি সূচক উত্তর প্রার্থনীয়।

নিবেদক

শ্রী সত্যচরণ সেন কবিরাজ

সম্পাদক



আয়ুর্ব্বিজ্ঞান সম্মিলনী

শ্রাবণ, ১৩৩৮ } শ্রাবণ { ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা,

"আয়ুর্ব্বিজ্ঞান সম্মিলনীর" পথ

১ ন

(কবিরাজ শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থ)

সে আজ এক বছরের কথা, বরষার বাদলধারা যখন সবে মাত্র তার বার্ষিক যাত্রা সুরু করেছে—তারই একদিনে আমাদের ঘরের ভেতর, আয়ুর্ব্বেদের আশা ও উন্নতির কথা হচ্ছিল। ছিলাম দুজন—খুড়োমহাশয় ও আমি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেদিন কোথা দিয়ে কেটে গিয়েছিল জানিনা, কিন্তু কথা যখন প্রায় শেষ হয়ে এল, তখন খুড়োমহাশয় বলে উঠলেন, "না বিমল! শুধু ও সব তাতে হবে না, কাগজ চাইই।" খুড়োমহাশয়ের মাথায় যখন যেটা উঠে, সেটা তখনি শেষ করবার ব্যবস্থা হয়। এক্ষেত্রেও তার ত্রুটি হ'ল না, কাগজ, কলম নিয়ে Scheme ছকতে বসে গেলেন। সেটা শেষ হলে, অনেক আলোচন পর স্থির হ'ল যে—"অসহযোগ আন্দোলন" চলা পর্য্যন্ত কোন নূতন কাজে হাত দেওয়া হবে না।

খুড়োমহাশয়ের সে কথাটা মনে ছিল এবার বৈশাখ মাস প'ড়্তেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, "লেখা" সংগ্রহ কর্ত্তে লাগ্লেন, মধ্যে মধ্যে "কাগজের" স্থায়িত্ব ও প্রবন্ধ-গৌরবের সম্বন্ধেও আলোচনা হচ্ছিল। একদিন বল্লেন,—"তোমাকেই সম্পাদক হ'তে হবে।" অনেক তর্ক-যুক্তির অবতারণা ক'রে যখন নিষ্কৃতি পেলাম—মনে হচ্ছিল, তখনও বল্লেন, "তোমার নাম না দিলে" স্থায়িত্ব ও প্রবন্ধ-গৌরব বিষয়ে তোমার সাহায্য পাব না—সুতরাং ও সব কথা শুন্বোনা। যেরূপেই হোক তোমার নাম রাখতে হবে, এবং দুইজনে মিলে কাগজখানিকে "একটা "বড় কাগজে" পরিণত কর্ত্তে হবে।" আমি বেগতিক বুঝে অস্বীকার কর্ত্তে পারলাম, না। কাগজ বের হ'লে, দেখ্লাম আমার নাম "প্রবর্ত্তক" হিসাবে রয়েছে।

অন্তর্যামীর প্রেরণায় যে কোন কাজ প্রবর্ত্তিত হ'লে যদি প্রবর্ত্তক বলা হয়, তবে সে প্রবর্ত্তক খুড়োমহাশয়, আমি সহায়তাকারী মাত্র, তবুও যখন আমার নাম দিয়েছেন ও প্রবর্ত্তক হিসাবে আমায় ২।১ কথা বল্বার অধিকারও দিয়েছেন, তখন ২।১টী কথা বল্তে হবে।

প্রথম কথা আমার কাণের কাছে বাজ্চে—"কাগজখানি বড় কাগজে পরিণত কর্ত্তে হবে"

এইটীই আজ আমাদের সমস্যা—কি করে কাগজখানিকে বড় কাগজে পরিণত করা যায়। কলিকাতায় ৩৩১ খানা (?) মাসিক চল্চে, চিকিৎসা, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু ভাষায় বহু মাসিক প্রকাশিত হচ্ছে ও কতকগুলি বাস্তবিকই বাংলার গৌরবজনক ভাবেই

পরিচালিত হচ্ছে, আর আমাদের দ্বারা আয়ুর্ব্বেদ-প্রধান চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যের একখানি কাগজ পরিচালিত হতে পারে না—ইহা আমি মনে করিনা। না হলে বাংলার কবিরাজ সম্প্রদায়ের পক্ষেও ইহা লজ্জার কথা।

"বড় কাগজ কাকে বলে"—এ তর্ক এখানে তুলতে গেলে আজ আমাদের 'খেই' হারিয়ে যেতে হবে। মোটা কথায় এইটুকু বুঝি, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার দিক্ দিয়া, জন সাধারণের ও চিকিৎসক সমাজের প্রয়োজনের দিক দিয়া, আলোচনার উপযুক্ত খোরাক সামঞ্জস্য রেখে যত বেশী ও ভাল ভাবে পরিবেশন কর্ত্তে পারা যাবে, ততই কাগজ জনপ্রিয় হতে পারে ও বড় বলা যেতে পারে।

কথাটা ভাবা সহজ কিন্তু "আলোচনার উপযুক্ত" খোরাক "সামঞ্জস্য" রেখে "বেশী" ও "ভালভাবে" পরিবেশন করা সহজ কথা নয়। বাংলাদেশে খুব অল্প মাসিকই আছে, বিশেষতঃ চিকিৎসা বিভাগে—যারা জোর করে এ কথা বলতে পারে। আমরাও যে এখনই বা শীঘ্র বলতে পার্ব্ব, তা মনে হয় না—তবে ঐ আদর্শ ও লক্ষ্য, নিয়ে চেষ্টা কর্ত্তে থাকলে এবং যাঁদের সহযোগিতার উপর নির্ভর করে, এই কাগজ বের করা হয়েচে, তাঁদের সাহায্য হতে বঞ্চিত না হলে, আমরা সফল হতে পার্ব্ব—এ দৃঢ়বিশ্বাস আমার আছে"।

এখন আলোচ্য হচ্চে এই—স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার দিক্ দিয়া জনসাধারণের ও চিকিৎসক সমাজের প্রয়োজন কি?

আজ সমগ্র পৃথিবীতে জনসাধারণের স্বাস্থ্যতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞানের প্রচারের জন্য বিপুল আগ্রহ লক্ষিত হচ্চে। শুধু প্রচারের জন্য নয়, স্বাস্থ্য কিসে রক্ষিত হয়—এর জন্যও বিভিন্ন বিভিন্ন মহাদেশে স্বতন্ত্রভাবে ও মিলিতভাবেও যথেষ্ট গবেষণার কার্য্য হচ্চে এবং সে সমস্ত কাজ যথারীতি প্রকাশিত হচ্ছে, কিন্তু ভারতে তো তার সিকির সিকিও হয় না।

স্বাস্থ্য হিসাবে বাংলার স্থান কত নীচে, তা' বোধ হয় আর বোঝাতে হবে না, আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার প্লাবনে আমরা আমাদের পুরাতন স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মকানুনও হেলায় হারিইচি বা হারাচ্চি, আর নূতনেরও সন্ধান পাই না। "সম্মিলনী" সব চেয়ে বড় কাজ কর্ব্বেন—যদি আবার বাংলার শিক্ষিত সমাজের মধ্যে হাজার হাজার বছরের পরীক্ষিত এদেশের (আয়ুর্ব্বেদের স্বাস্থ্যতত্ত্ব) জানাতে পারেন এবং এদেশের উপযোগী দেশবিদেশের স্বাস্থ্যতত্ত্বের নূতন গবেষণার সংবাদ তাদের কাছে পৌছে দিতে পারেন। ভেজালে দেশ উচ্ছন্ন যেতে বসেচে, ধারাবাহিকভাবে যদি এর বিরুদ্ধে আন্দোলন ক'রে দেশবাসীর চৈতন্য সম্পাদন করা যায়, তবেই এর প্রতিকার হয়। যে দেশের প্রজারা এ সব বিষয়ে সচেতন এবং প্রজার মতের উপর গভর্ণমেণ্ট ও ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদের অস্তিত্ব নির্ভর করে, সেদেশে 'ভেজাল' পদার্থ প্রায় এখন 'শব্দমাত্রে' অবস্থিত। আমাদের দেশের দায়িত্বাভিমানী আমলাতন্ত্র অথবা ব্যবস্থাপক সভা—কেহই এর উচ্ছেদের জন্য আজ পর্য্যন্ত দৃঢ়সঙ্কল্প কেন হননি!—একথাটী মনে রেখে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের চেষ্টা কর্ত্তে হবে।

চিকিৎসক সমাজের দিক্ দিয়াও "সম্মিলনীর" প্রয়োজন বিবিধ। প্রথম কবিরাজ সম্প্রদায়ের কথাই ধরা যাক। বাংলা দেশে অন্যূন পঞ্চাশ হাজার কবিরাজ আছেন, কিন্তু তাঁহাদের না আছে, সভা, সম্মিলন, সাক্ষাৎ আলোচনা, না আছে মুখপত্র" তাঁরা যেন "নির্ব্বাত নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্"—অচলায়তনে ধ্যানমগ্ন। তাঁদেরই শাস্ত্রের শাখাপ্রশাখা আজ বর্দ্ধিত হ'য়ে যে মূলবৃক্ষকে ছাড়িয়ে চ'লচে—এ দেখবার দৃষ্টি বা বুঝবার শক্তি তাঁদের নেই, অথবা নিজেদের শক্তিতে আস্থা হারিয়ে তার প্রতীকার নেই ভেবেই নিশ্চেষ্ট আছেন, অথবা এসব সংবাদ তাঁদের জানবারও কোন সুযোগ নাই। "সম্মিলনী" যদি ইঁহাদের কথা শুনবার ও শুনাবার ভার নিতে পারেন—চিকিৎসক সমাজের একটা বড় প্রয়োজন সাধিত হবে।

বৈদ্যকাষ্টকম্

(কবিরাজ শ্রীপূর্ণেন্দু গুপ্ত কাব্যতীর্থ কবিভূষণ ভিষগাচার্য)

অখিলভারতবর্ষনিজস্ব হে,
নিজবিভাসু বিভাবিতলোক হে,
পরম শাশ্বত শান্ত শিবোজ্জ্বল
সকল-সুন্দর—হে মম বৈদ্যক !

শুভশুভে দিবসে স্বয়মাগতং
ততইত স্বনসি প্রপুরাতন !
নব পুরাণযুগব্রজ-যাগযুগ্
বহসি সেতু তুলাং পরপূর্বয়োঃ ॥

কুহ গতা ননু তে তব সঙ্গিনঃ
ত্বমসি যৈ ঋসিভাবত মানীতং ?
বিগত কীর্ত্তি ঘটাস্মৃতিমাবহৎ
ত্বমধুনাপি বিরাজস উদ্ধতং ॥

ত্বয়ি বৃথা কিল কালকদর্থনা
গগনভৈরবসৌম্য সদাব্যয় !
বহুলবিপ্লবঘাতজয়ি ধ্রুবং
জনহিতায় চিরায় ভবত্বপি ॥

জ্ঞানবাজ্যমখিলং সুশাসয়ন্
মন্ত্রভেষজকলম্ প্রদর্শয়দ্ ।
বস্তুদৃষ্টিমুকুরে স্থিতেত্বয়ি
বেদবক্তৃক ইতি—শ্রুতি স্থিতা ॥

এষণাত্রিতয়সাধুসাধনাং
কে বদন্তু বদ লৌকিকা নরং ?
ঐহিকাদপরলোকগামিনীং
কে দিশন্তু সরণিং ত্বয়া বিনা ?

লৌকিকাস্তু যদিদং বদন্তু বা
বিশ্বসৃষ্টিবিষয়ং বিমোহিতা ।
ভূত-তত্ত্ব-কথনে গুরো স্তব
তে প্রযান্তু কিয়াদব পৌরুষং ॥

শ্রীবৈদ্যকং যদি সদা শরণং কিমন্যৈঃ ?
পূর্ণেন্দু দীপ্তিসময়ে কিমু তারকাভিঃ ?
গুপ্তস্ববর্গমখিলং রুচিতং তদৈব
স্বারাজ্য মীপ্সিততমং সুখমেব—(গণ্যং) ॥

জীবন তত্ত্ব

(ডাঃ শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ)

মানুষের ধর্ম্ম বলিতে হইলে, দেহ, ইন্দ্রিয়, দৈহিক যন্ত্রাদি, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও আত্মার আলোচনা করিতে হয়। যেহেতু এই সকলের সংযোগেই মানুষের সৃষ্টি। কেবল মানুষ বলিয়া নহে, সূক্ষ্মতম জীবাণুও এই সকলের সংযোগ-সমষ্টি-ফলে বিরচিত। কিন্তু এই প্রবন্ধে আমরা মানব-জীবন-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিব। সুতরাং এস্থলে জীবনতত্ত্ব সর্ব্বাগ্রে আলোচনীয়।—এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় বস্তু আমরা দুই ভাগে বিভক্ত দেখিতে পাই, চেতন ও অচেতন। অচেতন পদার্থ সকল আমাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট, যেমন প্রস্তর, ভূমি খনিজ পদার্থ ইত্যাদি।

কিন্তু এই সকল পদার্থ যে একবারেই বিশুদ্ধ অচেতন, তাহা বলা যায় না। বেদান্ত শাস্ত্র বলেন—সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম—অর্থাৎ এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান যে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপার, আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সম্মুখে অবভাসমান তৎসকল ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু নহে। অসম্যক্‌জ্ঞানের ফলে রজ্জুতে যেমন সর্পের অধ্যাস হয়, সেইরূপ আমাদের মায়াদুষ্ট জ্ঞানের সমক্ষে এই জগৎ-প্রপঞ্চ অবভাসিত হইয়া থাকে। ইহাই মায়াবাদের সিদ্ধান্ত। ইহার অপর প্রসিদ্ধ নাম বিবর্ত্তবাদ।

অন্য প্রকারেও আমরা জগৎতত্ত্বের এবং জীবন তত্ত্বের আলোচনা করিতে পারি। শ্রুতি বলেন, তৎসৃষ্ট্বা তদনুপ্রাবিশৎ অর্থাৎ এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া পরমাত্মা অন্তর্য্যামিরূপে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট আছেন। এই শ্রুতিতে আমরা চেতন ও অচেতনের বিভাগ স্পষ্টতঃই প্রাপ্ত হইতেছি। ইহাতে আমরা ইহাই বুঝিতে পারিতেছি যে, প্রত্যেক অচেতন বস্তুতে জীব-শক্তি বর্ত্তমান। তাহারই প্রভাবে পদার্থমাত্রেই আপন আপন অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া জাত, পরিবর্দ্ধিত, বিপরিণমিত, ও উপসংহৃত হইতেছে। চেতনঅন্তর্য্যামী অচেতন দেহে প্রবিষ্ট থাকিয়া উহাকে প্রতিক্ষণ নিয়মিত ও পরিচালিত করিতেছেন। আমরা বৃহদারণ্যক উপনিষদে, এই অন্তর্য্যামী পরমাত্মার সবিশেষ সংবাদ প্রাপ্ত হই। ইহাতে জগতের বহু দুর্ম্মীমাংস্য ব্যাপারের পরিস্ফুট মীমাংসা বুঝিয়া লইতে পারি। জড় দেহে কি প্রকারে চেতনার আবির্ভাব হয়, জড়বাদী পণ্ডিত-গণ চিরদিন ইহা লইয়া তাঁহাদের জ্ঞানানুগত সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া আসিতেছেন। বহু প্রাচীন কাল হইতে ভারতীয় বার্হস্পত্য সম্প্রদায়ের চার্ব্বাকগণ এই সিদ্ধান্ত করিয়া আসিতেছেন যে, জড় হইতে চেতনার আবির্ভাব হইয়া থাকে। জড়দেহাতিরিক্ত পৃথক কোন চেতন পদার্থ নাই। বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের অধিকাংশই এই অভিমতের সমর্থক ও সম্পোষক। তাঁহারা জড়বিজ্ঞানের আলোচনায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, যাঁহাকে চেতনা, বা জীবনীশক্তি (Vital fiorce) বলা হয়, উহা জড় শক্তি ভিন্ন অপর কিছু নহে। জড় শক্তি ভিন্ন অপর কোন জীবনীশক্তি নাই। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের প্রায় সকলেই এই মতঅবলম্বী। জীবন কাহাকে বলে, এ প্রশ্নের উত্তরে তাঁহারা নানাপ্রকার জড়-ও-শক্তি নিষ্পাদ্য ক্রিয়াবিশেষ বলিয়া সঙ্ক্ষেপতঃ উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়া থাকেন। এ বিষয়ে আমাদের আয়ুর্ব্বেদ যে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমরা অন্তর্য্যামী পরমাত্মার উল্লেখ করিয়া সংক্ষেপতঃ একরূপে তাহার আভাস প্রকাশ করিয়াছি। সে বিষয়ে যদি কেহ বিস্তারিতরূপে জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে একবার কিঞ্চিৎ মনোযোগের সহিত—"চরকসংহিতা" নামক, সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্যক গ্রন্থখানি পাঠ করিবেন। উহা বঙ্গভাষাতে অনূদিত হইয়াছে। আমরা এই প্রবন্ধে সেই সকল সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিব না। সে সম্বন্ধে বঙ্গভাষায় বহুত্র বহুবার বহুজন কর্ত্তৃক আলো-চনা হইয়া গিয়াছে। পাশ্চ্যত্য পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে কিরূপ আলোচনা করিতেছেন, তৎসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আভাস দেওয়াই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছেন যে, কেবল একমাত্র দেহ-বিদ্য় শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে (Physiological Hypothesis) জীবন-তত্ত্বের পরিস্ফুট ও সন্তোষজনক সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। তদ্ব্যতীত জীবনতত্ত্বে বহু গূঢ় গভীর রহস্য পরিলক্ষিত হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা আমরা বর্ত্তমান সময়ে জীবনতত্ত্ব সম্বন্ধে বহুল সূক্ষ্ম তথ্য জানিতে পারিতেছি। কিন্তু জড়শক্তির উপরে যে সূক্ষ্মতম মহামহিয়সী শক্তি বিরাজমানা, কোন সদ্‌যুক্তিতে তাহাও অস্বীকার করা যায় না। আমরা স্থূল চক্ষে পদার্থনিচয়ে স্থূলজ্ঞানই লাভ করি। কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বহুল সূক্ষ্ম বিষয় আমাদের জ্ঞানক্ষেত্রের সমক্ষে উপস্থাপিত হইতেছে। সেই সকলের প্রতি দৃষ্টি রাখাও আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, ঋষিগণ যোগনেত্র-প্রভাবে জীবনতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার অধিকাংশ আমাদের ন্যায় স্থূলবুদ্ধির দুষ্প্রেক্ষ্য তাঁহাদের সিদ্ধান্ত বুঝিতে হইলেও

আধুনিক বৈজ্ঞানিক-শিক্ষালাভের প্রয়োজন। আধুনিক বিজ্ঞান আর্য্যসিদ্ধান্তে প্রবেশের প্রধান সহায়, সুতরাং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আলোচনা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের পক্ষেও অবহেলার বিষয় নহে। আবার অপর পক্ষে যাঁহারা আধুনিক বিজ্ঞানের চাকচিক্যে, আধুনিক বিজ্ঞানের ব্যবহৃত শব্দচ্ছটায় এবং আধুনিক বিজ্ঞান প্রকল্পিত বহু প্রকারের যন্ত্রাদি দর্শনে প্রাচীনতম আর্ষ জ্ঞানকে অবহেলা, অবজ্ঞা অনাদর ও উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, তাঁহাদের বিচার-বুদ্ধিরও আমরা প্রশংসা করিতে পারি না। আধুনিক বিজ্ঞান কিপ্রকারে ধীরে ধীরে ভারতীয় প্রাচীনতম যোগবলসম্পন্ন ঋষিগণের যোগবিদ্যালোকিত সিদ্ধান্ততত্ত্বের অভিমুখে ধাবিত হইতেছেন, তাহাও ইঁহাদের দ্রষ্টব্য, আলোচ্য ও বিবেচ্য।

মাইকেল ফস্‌টার ইংলণ্ডের একজন সুবিখ্যাত শরীর-ক্রিয়া-বিজ্ঞানবিদ্ (Pysiologist) পণ্ডিত, ইনি এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা নামক বিশ্বাভিধানে Physiology নামক প্রবন্ধের—একস্থানে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, আমাদের নানাবিধ যন্ত্র এবং অধিক শক্তিসম্পন্ন দুরবীক্ষণ যন্ত্র থাকা সত্ত্বেও জৈব বস্তু সম্বন্ধে আমরা সবিশেষ জ্ঞানলাভ করিতে পারি নাই, আমাদের অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ না হইলে, আমরা অধিক কিছু জানিতে সমর্থ হইব না।

ফলতঃ (Protoplasm) বা জৈববস্তু সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জীবতত্ত্ববিৎগণ (Biologists) এবং দৈহিক সূক্ষ্ম উপাদানতত্ত্ববিৎগণ (Histologist) অনুবীক্ষণ ও রাসায়নিক পরীক্ষার বিবিধ যন্ত্রাদি সহ নানাপ্রকার পরীক্ষা করিয়াও উহার প্রকৃত তথ্য অবগত হইতে পারেন নাই। ইংলণ্ডের ক্যাভানডিস লেবোরেটারীতে বার্ক এবং স্কেফার প্রভৃতি রসায়ন শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ নানাপ্রকার বিশ্লেষণ-প্রক্রিয়ায় জৈবপদার্থে Protopasm যত ভাগ নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন ইত্যাদি মৌলিক-পদার্থ আছে, তাহা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে নির্ণয় করিয়াও সেই সকল পদার্থের সংযোগে জৈবপদার্থের সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। বৈজ্ঞানিকগণ জীবনী-শক্তির গূঢ় রহস্য ভেদ-করার জন্য যতই প্রয়াস পাইতেছেন, কিন্তু রহস্যময়ী প্রকৃতি কিছুতেই আপনার সে গুপ্ত ধন ইহাদের নয়ন-সমক্ষে প্রকাশিত করিতে ইচ্ছুক নহেন। মানুষের জ্ঞানের প্রয়াস ও জ্ঞানের আলোক যতই বৃদ্ধি পাইতেছে, সুচতুরা প্রকৃতি ততই ইহাদের প্রয়াস ও প্রযত্নকে উপহসিত করিয়া অজ্ঞান-অন্ধকারের পরিধি ক্রমে বৃহত্তর করিয়া তুলিতেছেন।

মানুষের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ধর্ ধর্ করিয়াও উহা ধরিতে পারিতেছে না। শ্রীভাগবত পুরাণে লিখিত আছে, কালযবন যখন মথুরা আক্রমণ করিতে উপস্থিত হন, তখন শ্রীকৃষ্ণ কোনও অস্ত্র হস্তে না লইয়া পদব্রজে কালযবনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কালযবন শ্রীকৃষ্ণকে চিনিতেন, তাঁহাকে দেখা মাত্র তিনি সমরনীতি অনুসারে রথ হইতে অবতরণ করিলেন এবং কোনও অস্ত্র হস্তে না লইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ধরিবার জন্য তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইলেন। কালযবন সহ যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত না হইয়া অন্য কোন উপায়ে শ্রীকৃষ্ণ তাহার নিধন উপায় সম্পাদন করিবেন, এই অভিপ্রায়ে চতুরতাপূর্ব্বক ভীত-ভীত ভাবে এমন ভাবে দৌড়িতে লাগিলেন, যে, কালযবন ধর্ ধর্ করিয়াও যেন তাঁহাকে না ধরিতে পারে। এইরূপে উহাকে এক পর্ব্বতের অন্ধকারময় গুহায় লইয়া গিয়া নিজে অদৃশ্য হইলেন। সেই গুহায় দেব-দানব-যুদ্ধ-প্রত্যাগত রাজা মুচকুন্দ নির্ব্বিঘ্নে ঘুমাইতেছিলেন। রাজা মুচকুন্দ সমরক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়া দেবতাদের প্রীতি উৎপন্ন করিয়াছিলেন। যুদ্ধ-অবসানে দেবতারা তাঁহাকে এই বর দিয়াছিলেন যে, তুমি মথুরার অন্তর্গত একটি গিরিগুহায় নির্ব্বিঘ্নে ঘুমাইবে। যদি কেহ তোমার নিদ্রা ভঙ্গ করে সে তৎক্ষণাৎ তোমার ক্রোধানলে ভস্মীভূত হইবে এবং ঐস্থানে তুমি শ্রীকৃষ্ণ দর্শন লাভ করিয়া মুক্তি পাইবে।

এস্থলে এই পৌরাণিক আখ্যায়িকা-উত্থাপনের অভিপ্রায় এই যে, মানুষের বিজ্ঞানও কালযবনের ন্যায় জীবন-রহস্য ধরিতে গিয়া ধর্ ধর্ করিতে করিতেও ধরিতে পারে না, অবশেষে অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু উহার উদ্দেশ্য সফল হয় না।

ইহাতে কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, আমরা জীবনতত্ত্বের অনুসন্ধানে একবারেই বৈজ্ঞানিক পন্থার বিরোধী। জড়বিজ্ঞানের প্রণালী-অনুসারে জীবন-তত্ত্বের অনুসন্ধান না পাইলেও ইহাতে আমাদের চিন্তাধারা ক্রমে পরিস্ফুট হইবে। প্রত্যেক বিফলতাতে আমাদিগকে সফলতার পথে লইয়া যাইবে। অন্ধকারের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে হয়তো কোন দিন জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোক সহসা মানবনেত্রের সমক্ষে প্রোজ্জ্বলরূপে দেখা দিবে। আমরা এইরূপে একদিকে জড়বিজ্ঞানের দ্বারাও জীবনের বহুল সূক্ষ্মতথ্য জানিতে পারিব। এই প্রণালী সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদিগকে সাফল্য প্রদান না করিলেও গৌণভাবে আমাদের অনুসন্ধানের প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবে। আমরা অবশেষে প্রকৃত জ্ঞানের প্রশস্ত পন্থা প্রাপ্ত হইব। তখন এই পথ-পরিত্যাগের মধ্যেও আমরা অভিনব আলোকের কিরণ-রেখা দেখা পাইব। তখন আমরা বুঝিতে পারিব,—A giving up as a condition of a more abundant having. জীবনতথ্য অনুসন্ধানের জন্য প্রথমতঃ আমাদিগকে প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্য দিয়া চলিতে হইবে। নিয়মের ভিতর দিয়া না চলিলে জীবন-তথ্যের স্ব-রাজ্যে আমরা প্রবেশ করিতে পারিব না। নিয়মতন্ত্র ও স্বরাজ্যতন্ত্র একই সূত্রে অনুস্যূত। প্রকৃতির নিয়মের মধ্যে জীবনতত্ত্বের স্বারাজ্য প্রতিষ্ঠিত। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের স্বদেশহিতৈষী মহোদয়গণ স্বরাজলাভের জন্য ব্যাকুল হইতেছেন। এ স্বরাজ বা স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলেও নিয়মতন্ত্রের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। তদ্ভিন্ন স্বারাজ্য বা স্বাধীনতা লাভের অন্য উপায় নাই। নিয়মতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা একই সূত্রে গাঁথা। এই উভয় পরস্পরসংশ্লিষ্ট ও সংনিরুদ্ধ (Union of law and Liberty)। যেখানেনিয়ম; তন্ত্রতা সাফল্যলাভকরে, সেখানে স্বারাজ্য বিরাজমান। The liberty is truly none the less, is only there, where law is perfectly fulfilled—এই ইংরাজী মহাবাক্য আমি অনেক স্বদেশী সভায় অনেকবার বলিয়াছি।

জীবনতত্ত্ব অনুসন্ধানেও এই সূত্র আমার অবলম্বনীয়; ইহা বাস্তবিকই সূত্র লক্ষণ সম্পন্ন—"সারবৎ বিশ্বতো মুখম্" স্বাধীনতার ভিতরে নিয়মতন্ত্রতা গূঢ় ভাবে বিরাজমান, (In the perfectness of freedoom, the perfectness of obedienee lies hidden, each in each.) সুতরাং প্রকৃতির নিয়ম পরতন্ত্রতার মধ্য দিয়াই আমরা জীবনতথ্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। ইহা কেবল আমার স্বকপোল কল্পিত অভিমত নহে। ভারতীয় বৈদান্তিক ঋষিগণ এই প্রণালীতে জীবনের জীবন, আত্মার আত্মা পরব্রহ্মতত্ত্বের সন্ধান করার উপদেশ দিয়াছেন। বেদান্ত দর্শনের দ্বিতীয় সূত্রটীর পর্য্যালোচনা করিলেই তাহা বুঝা যায়।

ব্রহ্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু শিষ্যগণ বেদান্তাচার্য্য ঋষির নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্, কৃপা করিয়া আমাদের নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব বলুন? ইহার উত্তরে আচার্য্যদেব বলিলেন, "জন্মাদ্যস্য যতঃ অর্থাৎ যাহা হইতে এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, যাহাতে উহার স্থিতি এবং যাহাতে উহার লয় হয়; তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে, অর্থাৎ জগৎ তত্ত্বের আলোচনা করিতে করিতেই ব্রহ্ম তত্ত্বের সন্ধান পাইবে। শিষ্যগণ জগৎতত্ত্বের আলোচনা করিতে করিতে উহার অন্তরালে নিত্যসত্য সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সন্ধান পাইলেন। পাশ্চাত্য দার্শনিক বলেন,—"from nature to nature's God" অর্থাৎ প্রকৃতি হইতেই প্রকৃতির অধীশ্বর ভগবানের সন্ধান পাওয়া যায়। ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ অপরা ও পরাভেদে তাঁহার দুই প্রকৃতির কথা বলিয়াছেন। তাঁহার পরাকৃতিই —জীব, সুতরাং আমরা স্থূল প্রকৃতির ও সূক্ষ্ম প্রকৃতির আলোচনা করিতে করিতে পরা প্রকৃতি বা জীব প্রকৃতির সন্ধান পাইবার প্রয়াস পাইব।

যক্ষ্মা

(কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ)

ধাতুক্ষয়ের পর শরীরে যক্ষ্মারোগ আবির্ভূত হয়। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ধাতুক্ষয়ের চারিটী কারণের উল্লেখ আছে।

(১) বেগরোধ—অর্থাৎ উপস্থিত মল-মূত্রের বেগধারণ।

(২) ক্ষয়—যে কোন কারণে দীর্ঘকাল রোগভোগ জন্য, অপুষ্টিকর ও অল্প আহার গ্রহণ জন্য, চিন্তা, শোক, বার্দ্ধক্য, অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় প্রভৃতি কারণে পোষণের অভাব জন্য ধাতুক্ষয়।

(৩) সাহস—সামর্থ্যের অতিরিক্ত কর্ম্ম সম্পাদনের চেষ্টা।

(৪) বিষমাশন—সমের বিপরীতকে বিষম বলে। সম আহারের বিপরীত আহারকে বিষমাশন বলে। আহার সাম্য-আহার পরিমাণের উপর নির্ভর করে। যেরূপ আহার প্রকৃতিকে বাধা না দিয়া যথাকালে জীর্ণ হয়, তাহাকেই সম আহার বলে। ইহার আধিক্য বা অল্পতা বিষমাশন। আহার গ্রহণ করিবার একটি নির্দ্দিষ্ট কাল আছে। তাহাকে অন্নকাল বলে। যেমন, পূর্ব্বভুক্ত জীর্ণ হইলে যখন ক্ষুধার উদ্রেক হয়, সেই সময়কে অন্নকাল বলা হয়। অন্নকালে যদি খাদ্য গৃহীত না হয় কিংবা ক্ষুধার উপলব্ধি না হইতেই যদি খাদ্য গৃহীত হয়, তাহাকেও অকাল ভোজন জনিত বিষমাশন বলা হয়। খাদ্য-প্রকৃতি বুঝিয়া খাদ্য গ্রহণ করিতে হয়। এইজন্য খাদ্যের গুরু, লঘু, পুষ্টিকর, পুষ্টিহানিকর বিচার করা আবশ্যক। যে খাদ্য সহজে হজম হইয়া ধাতু সকলের সম্যক পুষ্টিসাধন করিবে, তাহাকে সমাশন বলা যায়। ইহার বিপরীত হইলে তাহাকেও বিষমাশন বলা হয়।

যক্ষ্মা রোগের নিদান এই চারিটী। নিদান সেবন জন্য বায়ু প্রকুপিত হইয়া শরীরের শোষণ উৎপাদন করে এবং রোগী দিন দিন শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় যদি প্রতিকার করা না যায়, তাহা হইলে প্রকুপিত বায়ু, পিত্ত ও কফকে প্রকুপিত করে। তখন মিলিত ত্রিদোষ—যক্ষ্মা-সম্প্রাপ্তি প্রাপ্ত হইয়া রোগ উৎপাদন করে। যক্ষ্মা সাধারণতঃ দুই প্রকারে ঘটিতে পারে। এক, ধাতুক্ষয় জন্য বায়ু প্রকুপিত হইয়া বিলোমভাবে পূর্ব্ববর্ত্তী ধাতুগুলির ক্ষয় সাধন করে। অপর, গুরুভোজন, আলস্য, আদ্রস্থানে বাস প্রভৃতি কারণে যদি ত্রিদোষের মধ্যে শ্লেষ্মার আধিক্য বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে ঐ কফের দ্বারা স্রোত সকল রুদ্ধ হইয়া পড়ে। তখন আর রস অন্যান্য ধাতুর পুষ্টির জন্য যথাযথ স্থলে যাইতে পারে না বলিয়া পরবর্ত্তী ধাতুগুলি ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আইসে। এবম্বিধ ক্ষয়কে অনুলোম ক্ষয় কহে।

শ্লেষ্মাধিক্যে যেমন স্রোতমার্গগুলি শ্লেষ্মার দ্বারা রুদ্ধ হয়, সেইরূপ যেখানে বাতাধিক্য থাকে, সেখানে স্রোতঃগুলি সঙ্কুচিত হয়। তাহার ফলে স্রোতরোধ ঘটে। যক্ষ্মা সম্প্রাপ্তিতে স্রোতরোধ অবশ্যম্ভাবী। স্রোতরোধ জন্য যেমন ধাতুপুষ্টির বাধা হয়, সেইরূপ পরিপাক ক্রিয়ারও বাধা জন্মে। কারণ পাচক পিত্তের স্রোত রোধ জন্য সম্যক ভাবে আসিয়া পাকের ক্রিয়া সাধন করিতে অসমর্থ হয়। ফলে অগ্নিমান্দ্য দেখা যায়। এই সময় যক্ষ্মার পূর্ব্বরূপগুলি প্রকটিত হয়। এ অবস্থায়ও প্রতিকার না করিলে রোগ ব্যক্ত ভাব ধারণ করে। তখন রস হৃদপ্রদেশে আবদ্ধ হইয়া কাসবেগের সহিত প্রবর্ত্তিত হয়। সাহস হেতুতে যদি বক্ষদেশে কোন প্রকার আঘাত লাগে, তাহা হইলে, প্রথম উরঃক্ষত হয় এবং সেই উরঃক্ষত জন্য অধিক শোণিত প্রবৃত্তি হইয়া সকল ধাতুকেই ক্ষীণ করিয়া যক্ষ্মা

রোগ উৎপাদন করে। এই রোগে অংস ও পার্শ্বদেশে বেদনা, হস্তপদে সন্তাপ এবং সর্ব্বাঙ্গব্যাপী জ্বর, অব্যভিচারী লক্ষণ। যক্ষ্মারোগ সর্ব্বক্ষেত্রেই রক্তাগম হইবে এমন কোন নিয়ম নাই। উরঃক্ষত না হইলে রক্ত আইসে না। এই রোগে জ্বর, অতিসার, অরুচি, কাস, শ্বাস, স্বরভেদ, অংস ও পার্শ্বের সঙ্কোচ, মাথা ভার বোধ হওয়া, বক্ষে, পৃষ্ঠে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ উৎপাদন করে এবং রোগী দিন দিন ক্ষীণ হইতে থাকে। সুচিকিৎসা না হইলে রোগ ক্রমেই বাড়িয়া অসাধ্য হয়। অনেকের ধারণা, যক্ষ্মারোগ অসাধ্য ; ইহা ঠিক নহে। প্রথম হইতে সুচিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করিলে রোগ দূর করা যায়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, যক্ষ্মা রোগে স্রোতঃ রোধ হয় বলিয়া ধাতু পুষ্টিকর ব্যাঘাত ঘটে, সুতরাং যাহাতে স্রোতঃ রোধ দূর হয়, তাহা করা একান্ত আবশ্যক। মরিচ একটি উৎকৃষ্ট স্রোতরোধক বলিয়া, 'রাজমৃগাঙ্ক' প্রভৃতি ঔষধে অনুপানরূপে প্রয়োগ করিতে শাস্ত্রে উপদেশ আছে। তজ্জন্য ঐ সকল ঔষধ মরিচ চুর্ণের সহিত প্রয়োগ করা উচিত। 'রাজমৃগাঙ্ক' একটি উৎকৃষ্ট ক্ষয়ঘ্ন ঔষধ। ইহাতে প্রচুর পরিমাণে কড়িভস্ম থাকায় উৎকৃষ্ট রক্তরোধক, উরঃক্ষতের ক্ষত নাশক এবং অগ্নিবর্দ্ধক। মরিচ চুর্ণের সহিত সেবন করিলে পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পায়, স্রোতঃ সকল পুষ্ট হয়।

'সর্ব্বাঙ্গসুন্দর' যক্ষ্মার কাস ও শ্বাস দূর করিতে এবং ধাতু পুষ্টি করিতে অত্যন্ত উপযোগী। যক্ষ্মার জ্বরশান্তির নিমিত্ত 'পুটপাক বিষম জ্বরান্তক লৌহ', 'জয় মঙ্গল রস' ও ও 'কস্তুরী ভৈরব, প্রযোজ্য, কাসবেগ কমাইবার জন্য 'তালিশাদি চূর্ণ একটু একটু মুখে রাখিয়া চুষিলে কাসির বেগ কমিয়া যায়। সেখানে কাসির বেগের সহিত রক্তস্রাব দেখা যায়, সেখানে 'এলাদিগুড়িকা' মুখে রাখিয়া চুষিলে উপকার লাভ করা যায়। অরুচিতে যোয়ান ভাজিয়া পুরাতন তেঁতুল ও সৈন্ধব লবণের সহিত বাটিয়া সর্ব্বদা মুখে রাখিলে পরিষ্কার হয় এবং অরুচি নষ্ট হয়। স্বরভেদে 'কল্যাণ অবলেহ' প্রয়োজ্য। অংস পার্শ্বের সঙ্কোচ ও বেদনা দূর করিবার নিমিত্ত 'বাসাচন্দনাদি তৈল' মালিশ করিতে হইবে। রোগী অত্যন্ত ক্ষীণ হইলে 'কাঞ্চনাভ্র' প্রয়োগ করা উচিত। ঘর্ম্মাধিক্য অধিক থাকিলে মকরধ্বজ অর্দ্ধ রতি, সর্ব্বতোভদ্র ১বটী, প্রবাল ভস্ম ২রতি একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রয়োজ্য। অতিসার দেখা দিলে 'মহাগন্ধক' প্রয়োগ করা উচিত। যদি অতিসার প্রবলাকার ধারণ করে—তাহা হইলে 'কর্পূর রস' বা 'লাজগুঁড়া' প্রয়োজ্য।

রোগী ক্ষীণ না হয় অথচ অগ্নিবল অব্যাহত থাকে—এইরূপ ভাবে পথ্য প্রয়োগ করিতে হইবে। মাংসরস বিশেষতঃ ষড়ঙ্গযূষ প্রয়োগ করা উচিত। রোগীকে লঘু অথচ পুষ্টিকর খাদ্য দিতে হইবে। তৈলাভ্যঙ্গ এবং সহ্যানুরূপ ঋতুসুখকর জলে স্নান করান উচিত। বেগ ধারণ নিষিদ্ধ। খোলা বাতাসে থাকা হিতকর। রোগীর যাহাতে উদরাময় না আইসে এবং শুক্রক্ষয় না হয়, তৎ প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। খোলা যায়গায় বসিয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করিলেও বিশেষ উপকার লাভ করা যায়।

আয়ুর্ব্বেদে সংক্রামক ব্যাধিসূত্র

(কবিরাজ শ্রীবারাণসী নাথ গুপ্ত, বৈদ্যরত্ন)

সতত বা সাময়িক সংসর্গ জন্য যে সকল ব্যাধি এক শরীর হইতে শরীরান্তরে প্রসারিত হয়, সেই সকল ব্যাধিই "সংক্রামক ব্যাধি" বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত। অসংখ্য ব্যাধির মধ্যে সংক্রামক ব্যাধি সংখ্যায় কতপ্রকার, অর্থাৎ কোন্ কোন্ ব্যাধি সংক্রামক—তাহার নির্দ্দেশ কল্পে মহামতি সুশ্রুত তাঁহার স্বপ্রণীত সংহিতার নিদানস্থানে কুষ্ঠ নিদান ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়া গিয়াছেন—

"প্রসঙ্গাৎ গাত্রসংস্পর্শান্নিঃশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।
একশয্যাসনাচ্চৈব বস্ত্রমাল্যানুলেপনাৎ॥
কুষ্ঠং জ্বরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এবচ।
ঔপসর্গিক রোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরং॥ (সুঃ নিঃ)

অর্থাৎ সতত একসঙ্গে বাস, পরস্পর গাত্রসংস্পর্শ বা শ্বাস-প্রশ্বাসাদির মধ্যে বাস, এক পাত্রে ভোজন, একই শয্যায় পরস্পর শয়ন বা একাসনে উপবেশন, বস্ত্র মাল্য বা অনুলেপনাদির পরস্পর পরিবর্ত্তন ইত্যাদি কারণ সমূহের অন্যতম কারণে বা সমবায়ে কুষ্ঠ, জ্বর, যক্ষ্মা, নেত্রাভিষ্যন্দ (চোকউঠা) এবং ঔপসর্গিক রোগসমূহ শরীর হইতে শরীরান্তরে সংক্রমিত হইয়া থাকে। সুতরাং উল্লিখিত রোগ পঞ্চক বা রোগসমূহ, বলিবার কারণ,—সুশ্রুত সংহিতার টীকাকার মহানুভব ডল্বনাচার্য্য মহাশয় "ঔপসর্গিক রোগাঃ"—এই শব্দে ব্যাখ্যায় "শীতলিকাদয়ঃ" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, শীতলিকা বলিতে মসূরিকা অর্থাৎ বসন্তরোগ বুঝায়, কিন্তু তাঁহার লিখিত আদি শব্দের অর্থ কোন্ কোন্ রোগের বোধক, তাহা তিনি বিস্তারিতভাবে কিছু বলেন নাই, সুতরাং শীতলিকার সহিত গণনা করিয়া দেখিলে কুষ্ঠাদি রোগ কয়েকটী পঞ্চসংখ্যার অধিক হয়না। আর আদি শব্দের অর্থ উল্লিখিত রোগ ব্যতীত যদি অতিরিক্ত অন্যান্য রোগের বোধক হয়, তবে রোগ সমূহ বলাই সঙ্গত; যাইহউক তজ্জন্য বলিতেছিলাম, উল্লিখিত কুষ্ঠাদি রোগপঞ্চক বা রোগ সমূহ সংক্রামক রোগ সংজ্ঞায় অভিহিত।

এক্ষণে মহামতি ডল্বনাচার্য্যের ব্যাখ্যায় অনুল্লিখিত অনুমান নির্ভর আদি শব্দের বোধক অপরাপর রোগ বাদ দিয়া কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণে নির্ভর করিয়া আলোচনা করিতে হইলে আমরা কুষ্ঠ, জ্বর যক্ষ্মা, নেত্রাভিষ্যন্দ ও বসন্ত—এই পাঁচটী রোগ ব্যতীত আর কোন রোগেরই সংক্রামকতা আপাততঃ মনে করিতে পারি না। কিন্তু ইহাও সত্য যে, উক্ত কুষ্ঠাদি পঞ্চসংখ্যক ব্যাধি ভিন্ন, অতিসার ও প্রবাহিকা, প্রমেহ ও বাতরক্ত, ভূতোন্মাদ ও উপদংশ প্রভৃতি রোগও কচিত কোথাও অল্পবিস্তর সংক্রামক হইয়া থাকে, এবং স্থানে স্থানে এরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ বা কারণ সহায়ে তাহারা প্রকটিত হয় যে, তাহা কিছুতেই সংক্রামক নয়—এরূপ বলিবার উপায় থাকে না। অতএব এরূপ স্থলে আমরা কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি? যদি উল্লিখিত আর্ষপ্রমাণান্তর্গত কুষ্ঠাদি ব্যাধিপঞ্চকেই সংক্রামকতা সীমাবদ্ধ—এইরূপ সমাধান করা যায়, তাহা হইলে অতিসার-প্রবাহিকাদি রোগের সংক্রামকতা অস্বীকার করিতে হয়। কিন্তু যাহা প্রত্যক্ষীভূত, তাহা কিরূপে অস্বীকৃত হইতে পারে?

আমরা স্বতঃই ঋষিবাক্যে আস্থাবান, তাহার কারণ,—জ্ঞান ও বিজ্ঞান, তপঃসিদ্ধি ও সত্যনিষ্ঠা, প্রভাব ও ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি যাবতীয় গুণোৎকর্ষে সাধারণ মানব অপেক্ষা ঋষি মহর্ষিগণ বহু উচ্চে অবস্থিত। এজন্য অসর্ব্বজ্ঞ অবিমৃষ্যকারী আমরা, আমাদের কোন বিষয়ে

সংশয় উপস্থিত হইলে, সে সংশয়ের অপনোদন কল্পে সেই ত্রিকালদর্শী সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষিদিগের সুখমোক্ষবিয়ধাক কামধুক বাক্যাবলীই একমাত্র আমাদের আশ্রয়স্থল। মহর্ষি প্রণীত শাস্ত্রে কোন বিষয় অমীমাংসিত আছে, এরূপ বিশ্বাস আমাদের আদৌ নাই; বিশেষতঃ এই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র, যাহা বিশ্ববাসী তত্তাবৎ জীবসমূহের জীবন-মরণের গূঢ় রহস্য উপলব্ধি বিষয়ে আমূলাগ্র অসংখ্য অসংখ্য সূক্ষ্মতম তত্ত্বের অবতারণায় পরিপূর্ণ, সেই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অবশ্য জ্ঞাতব্য এরূপ একটা বিষয় অমীমাংসীত হইয়া আছে, এ কথা মুখে বলা দূরে যাউক, মনে ভাবিতেও প্রবৃত্তি হয় না। সংক্রামক ব্যাধির উল্লেখ প্রসঙ্গে সুশ্রুতাচার্য্য ধন্বন্তরি যাহা বলিয়াছেন,—

"প্রসঙ্গাদ্ গাত্রসংস্পর্শানিঃশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।
একশয্যাসনাচ্চৈব বস্ত্রমাল্যানুলেপনাৎ॥
কুষ্ঠং জ্বরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এবচ।
ঔপসর্গিক রোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরং॥

এই প্রশস্ত প্রমাণের অন্তর্নিহিত "ঔপসর্গিক রোগাশ্চ" এই সুপ্রযুক্ত শব্দটীর সাহায্যেই বোধ হয় তত্তাবৎ সমস্ত সংশয়েরই সমাধাম বা সুমীমাংসা হইতে পারে। যদিও উদারধী ডহ্বন "ঔপসর্গিক রোগাঃ শীতলিকাদয়ঃ" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই নীরব হইয়াছেন সত্য, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের রহস্যবিৎ বহুদর্শী পণ্ডিত শ্রীমৎ শ্রীকণ্ঠদত্ত মহাশয় মাধব নিদানের ব্যাখ্যায় "ঔপসর্গিক রোগাঃ" শব্দের প্রকৃতার্থ নিম্নোক্ত প্রকারে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন—

ঔপসর্গিকরোগা ইতি ঔপসর্গিকাঃ পাপরোগা-
দয়ো ভূতোপসর্গজা সংক্রামন্তি আবিশন্তি
রোগ সংক্রান্তিশ্চ কুষ্ঠিপ্রভৃতি পাপজনে সংস-
র্গেণ পাপসংক্রান্তেবিকার প্রভাবস্বোদ্ধব্যা॥

অর্থাৎ পাপ জন্য রোগও ভূতোপসর্গজ ভূতোন্মাদ প্রভৃতি রোগ ঔপসর্গিক রোগ নামে অভিহিত। কুষ্ঠি প্রভৃতি পাপিজনের সংসর্গ জন্য পাপের সংক্রমণ ও ব্যাধির প্রভাব বশতঃ সেই সেই রোগও শরীরান্তরে সংক্রমিত হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতম তত্ত্বানুসন্ধিৎসু গম্ভীর বুদ্ধি শ্রীকণ্ঠ দত্ত মহাশয়ের উল্লিখিত অর্থ অতীব সঙ্গত ও সমীচীন বলিয়াই মনে হয়, কেননা শাস্ত্রান্তরে স্মৃতি-পুরাণাদিতে সেই সেই সংহিতা-তন্ত্র প্রণেতা মহর্ষিগণও পাপজ সংক্রামক রোগের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উক্তরূপ মতই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

একব্যক্তির পাপ অপর ব্যক্তির শরীরে কিরূপ ভাবে সংক্রমিত হইয়া থাকে—তৎসম্বন্ধে মহর্ষি পরাশর বলিতেছেন—

আসনাৎ শয়নাৎ যানাৎ ভাষণাৎ সহভোজনাৎ।
সংক্রামন্তিহি পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি॥

অর্থাৎ পাপী লোকের সহিত একাসনে উপবেশন, একশয্যায় শয়ন একই যানে গমনাগমন, সতত সংলাপ ও একপাত্রে ভোজনাদি করিলে জলগত তৈলবিন্দু বিসর্পণের ন্যায় একব্যক্তির পাপ অপর ব্যক্তিতে বিসর্পিত অর্থাৎ সংক্রমিত হইয়া থাকে। এতৎপ্রসঙ্গে মহর্ষি দেবল বলিতেছেন,—

সংলাপ স্পর্শ নিঃশ্বাস সহশয্যাসনাশনাৎ।
যাজনাধ্যাপনাদ যৌনাৎ পাপং সংক্রমতে নৃণাং॥

অর্থাৎ পাপীর সঙ্গে আলাপ, পাপীকে স্পর্শ, পাপীর শ্বাস প্রশ্বাসের মধ্যে বাস, তাহার শয্যায় বা আসনে শয়ন বা উপবেশন, এমন কি পাপী ব্যক্তির যাজকতা, অধ্যাপনা বা যৌন সম্বন্ধে লিপ্ত থাকিলেও তাহার পাপ—সংসর্গকারীর শরীরে সংক্রমিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে প্রতিবাদ-প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, উল্লিখিত প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা পাপী ব্যক্তির সংসর্গে তৎসংশ্লিষ্ট পাপ তৎসংসর্গকারীর শরীরে সংক্রমিত হইতে পারে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া, পাপের সংক্রমণ হইতেছে বলিয়া তৎসঙ্গে তৎ সংশ্লিষ্ট ব্যাধিও যে সংসর্গকারীর শরীরে সংক্রমিত হইবে, এরূপ প্রমাণও কিছু পাওয়া যাইতেছে না?

ইহার উত্তরে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে, পাপের কোন একটা এরূপ শরীরবদ্ধ নির্দ্দিষ্ট মূর্ত্তি নাই—যদ্দারা সে একটা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহার উপাসকের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারে। ব্যাধিই পাপের মূর্ত্তি! ব্যাধি ব্যতীত পাপের স্বতন্ত্র মূর্ত্তি নাই। পাপের মাত্রা অধিক হইলে, উৎকট ব্যাধিদ্বারা তাহার উৎকট মূর্ত্তি প্রকাশ পায়, আর পাপের মাত্রা অল্প হইলে অল্পদোষ সম্পন্ন ব্যাধি দ্বারা অপেক্ষাকৃত তাহার অনুৎকট মূর্ত্তি দেখা যায় মাত্র। ভার্গবীয় কর্ম্ম বিপাক গ্রন্থে লিখিত আছে,—

পূর্ব্বজন্মকৃতং পাপং ব্যাধিরূপেন জায়তে।
তস্যোপশমনং কার্য্যং মন্ত্রদানার্চ্চনাদিভিঃ॥

অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মে কৃতপাপ ইহজন্মের ব্যাধিরূপে শরীরে প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহার উপশমন বিষয়ে ইষ্ট মন্ত্র বা মন্ত্রবিশেষের জপ, দান, দীক্ষা ও দেব, দ্বিজ, গুরুজনের অর্চ্চনা কর্ত্তব্য। (ক্রমশঃ)

সূক্ষ্মসৃষ্টি

(কবিরাজ শ্রীরাখাল দাস সেন কাব্যতীর্থ)

প্রকৃতির বৈচিত্র্যেই পুরুষের বৈচিত্র্য

একতাল সানাকাদা মাটীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া যেমন যেমন ছাঁচে ফেলা যায়, ঐ মাটীর খণ্ডগুলি তেমনই তেমনই মূর্ত্তি লইয়া বাহির হইয়া আসে। এইজন্য একই চৈতন্য বা আত্মা যখন কর্ম্মবশে যে যোনিতে প্রবেশ করে, তখনই সে সেইমত দেহ লইয়া জন্মগ্রহণ করে।—যে আত্মা আজ মানুষ হইয়া জন্মিয়াছে, সে যদি আবার প্রবৃত্তির বশে পশু যোনিতে জন্মলাভ করে, তবে সে পশুই হইয়া যায়। পুরাণে দেখা যায়, রাজা ভরত একবার মৃগ হইয়া জন্ম লইয়াছিলেন। জীবাত্মার প্রবৃত্তিই নানাবিধ যোনিতে জন্মলাভের একমাত্র হেতু। এইজন্য মহর্ষিগণ জীব প্রবৃত্তির উৎকর্ষ বিধানের জন্য নানাবিধ কর্ম্ম ও সদ্বৃত্তের উপদেশ দান করিয়া গিয়াছেন।

পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তরুলতা প্রভৃতি আমরা যে সকল সজীব পদার্থ দেখিতে পাই, ঐ সকল পদার্থের অভ্যন্তরে যে সকল জীবাত্মা বা চেতন পদার্থ অবস্থান করে, তাহারা যখন কেবল চেতনরূপে থাকে, তখন উহারা এক এবং যখন ঐ এক চৈতন্য বা আত্মা নানা প্রকৃতির সহিত মিলিত হয়, তখন আবার একই চৈতন্য বহু হইয়া যায়। কেন না প্রকৃতির বহুরূপ, সে রূপের আর অন্ত নাই। তদ্ভিন্ন ঐ প্রকৃতি—পুরুষ বা চেতনের সঙ্গে যখন মিলিত হয়, তখন অবিরাম প্রসব করিতেই থাকে (ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্)। যেমন কেবল পুরুষের দ্বারা বা কেবল স্ত্রীর দ্বারা সন্তান উৎপাদিত হয় না, উভয়ের সংযোগ আবশ্যক হয়, তদ্রূপ এই বিশ্বসৃষ্টি কেবল চেতন বা কেবল জড়ের দ্বারা হয় নাই, উভয়ের সহযোগে হইয়াছে। মানুষ যেমন কোন ঘট, পট, ঘর, বাড়ী, খেলনা, পুতুল, প্রস্তুত করিতে হইলে ঐ সকল পদার্থের উপকরণ স্বরূপ জড় পদার্থকে গ্রহণ করে, এবং তাহার দ্বারা ইচ্ছামত দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ করে, তদ্রূপ বিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব্বে পরমাত্মাও নিজেকে বহুরূপে রূপিত করিবার জন্য প্রকৃতিকে অবলম্বন করেন এবং বিশ্বসৃষ্টিকে ধ্বংশ করিবার জন্য প্রকৃতির সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া থাকেন।

কুম্ভকার বা স্বর্ণকারের ভবনে মাটির বা সোনার বহু পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল পদার্থের আকৃতি পরস্পর ভিন্ন, কাজেই উহাদের নামও এক নহে, পরস্পর ভিন্ন। হাঁড়ি, কলসী, শরা এবং বালা, চুড়ি, হার, মল ইত্যাদি। ঐসকল পদার্থ নামে-রূপে ভিন্ন হইলেও উহারা উপাদানে ভিন্ন নহে। আমরা খাবারের দোকানে বহুবিধ খাদ্য পদার্থ দেখিতে পাই, ঐ সকল পদার্থ—রূপে, গুণে ও স্বাদে পরস্পর ভিন্ন হইলেও যেমন ছানা, চিনি, ঘি, ময়দা, বেসম প্রভৃতি পাঁচটী পদার্থ ভিন্ন ঐ সকল পদার্থের অন্য কোন প্রকার উপাদান নাই। উক্ত পাঁচ প্রকার পদার্থের সমিশ্রণের তারতম্যানুসারে বহুবিধ ভক্ষ্য-ভোজ্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তদ্রূপ এই জগতে আমরা যে এত বিচিত্র পদার্থনিচয় দেখিতেছি, যে সকল গণনা করিয়া সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় না—ঐ সকল পদার্থেরও মূল উপাদান পাঁচটীর বেশী নয়। ঐ পাঁচটীর সংমিশ্রণের তারতম্যানুসারে বিশ্বের যাহা কিছু সকলেরই সৃষ্টি হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। সেই পাঁচ মূল পদার্থের নাম—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। ইহারা উত্তরোত্তর সূক্ষ্ম পদার্থ। ইহাদের সংস্কৃত নাম ভূত,—এজন্য এই পঞ্চ ভূতের দ্বারা সৃষ্ট পদার্থকে লোকে পাঞ্চভৌতিক পদার্থ বলে। গৃহ মাত্রের উপাদান খড়, কাঠ ও মাটী অথবা ইট, কাঠ ও চুণ। মানুষ যখন ঘরবাড়ী নির্ম্মাণ করে, তখন ঐ সকল গৃহের উপাদান একত্র করিয়া নিজের ইচ্ছানুরূপ সাজাইয়া গড়িয়া ঘর বাড়ী নির্ম্মাণ করে এবং যখন ঘরবাড়ী ভাঙ্গিবার ইচ্ছা করে, তখন ঐসকল উপাদানকে পৃথক করিয়া থাকে। এইরূপ প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়া পুরুষ বা জীবাত্মা যখন সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করে, তখন উক্ত পঞ্চভূতকে একত্র করিয়া বহুবিধ পদার্থের সৃষ্টি করে এবং যখন পুরুষ সৃষ্টি নাশ করিতে ইচ্ছা করে, তখন তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে উক্ত পদার্থ সকল পরস্পর বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে। সৃষ্টির মূল সূত্র মিলনে, ধ্বংশের মূলসূত্র বিচ্ছেদে,—এই সাধারণ সূত্রকে জগতের কেহই অপলাপ করিতে পারে না। সংসারের সুখসমৃদ্ধির সৃষ্টি তখনই হয়—যখনই স্ত্রীপুরুষের মিলন হয়, এবং সংসারের সুখসমৃদ্ধির ধ্বংশ তখনই হয়—যখন স্ত্রীপুরুষের বিচ্ছেদ হয়। এইরূপ মনের মধ্যে যখন সত্ত্বরজস্তমের মিলন হয়, তখন সংসারে অশেষবিধ পদার্থের সৃষ্টি ও আনন্দের প্রবাহ বহিতে থাকে এবং যখন মনের মধ্যে সত্ত্বরজস্তমের পরস্পর বিচ্ছেদ ঘটে, তখন সকল পদার্থের ধ্বংশ ও মন নিরানন্দে মরুভূমিতে পরিণত হয়, অপিচ যখন জীবদেহে বায়ু, পিত্ত, কফ অথবা বাহ্য জগতে অগ্নি, জল ও বায়ু পরস্পর মিলিতভাবে অবস্থান করে, তখন দেহ ও বিশ্বসংসার পরম আনন্দ ভূমি এবং যখন ঐ দেহে বা ঐ বাহ্যজগতে বায়ু, পিত্ত, কফ বা অগ্নি, জল, বায়ু পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে, তখন দেহে নানাবিধ দুঃখপ্রদ রোগ এবং বাহ্য জগতে অশেষবিধ ক্লেশের উপদ্রব বাড়িতে, বাড়িতে দেহ ও বিশ্বসংসারকে ধ্বংশ করিয়া ফেলে। অতএব জগতে যাবতীয় পদার্থ নিচয়ের মিলনে সুখ ও বিপদে দুঃখের উৎপত্তি।

কি বহির্জগৎ কি অন্তর্জগৎ—সর্ব্বত্রই যতদিন প্রকৃতি ও পুরুষের উভয়ের উভয়ের প্রতি অনুরাগ বা মিলনেচ্ছা থাকে, ততদিন জগতে সৃষ্টি ও রক্ষার ব্যাপার চলিতে থাকে, এবং যখন উহাদের বিচ্ছেদের ইচ্ছা প্রবল হইতে থাকে, তখন ধ্বংশ বা প্রলয় আরম্ভ হয়। প্রকৃতি স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে দ্বিবিধ। যে প্রকৃতির সহিত পুরুষের বৈরাগ্য উপস্থিত হয় সেই প্রকৃতির সহিতই পুরুষের বিচ্ছেদ হয়।

আমরা যে বাহ্য জগতে ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ দেখিতেছি, ইহারা কেহই মূলীভূত সূক্ষ্ম পদার্থ নহে, সবই স্থূল—ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ। অধিকন্তু ঐ সকল পদার্থ অবিমিশ্র ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ নহে, সবই পরস্পর মিলিত পদার্থ, তবে উহারা মিলিত হইলেও ভূমিতে ভূমির ; জলে জলের, অগ্নিতে অগ্নির,

বায়ুতে বায়ুর এবং আকাশে আকাশের অংশ অধিক পরিমাণে অবস্থিত। কেবল বস্তুর প্রাধান্য বশতঃ উহাদের ঐরূপ নাম করা হইয়াছে। অবিমিশ্র মূল ধাতু বা বিশুদ্ধ পঞ্চভূত—স্থূল ইন্দ্রিয় সাহায্যে দেখিতে পাওয়া যায় না।

ঘৃত, তৈল, তণ্ডুল, ইন্ধন, স্থালী ও পাচক এবং পাক করিবার বুদ্ধি বা ইচ্ছা— ইহারা যদি পরস্পর একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মিলিত না হয়, তাহা হইলে কখনই পাক-কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। এইরূপ সৃষ্টিকর্ত্তা, সৃষ্টির বুদ্ধি ও সৃষ্টির উপকরণ এই সকল পদার্থ একই উদ্দেশ্যে মিলিত না হইলে কোন পদার্থেরই সৃষ্টি হইতে পারে না। আমরা জগতে যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করিতেছি,— এ সকলই সৃষ্ট পদার্থ। এ সকলকে কে সৃষ্টি করিল? এ সম্বন্ধে অনেক মতবাদ আছে, তাহা আমাদের আলোচ্য বা বিচার্য্য নহে। আমাদের যাহা প্রয়োজন, তাহা সংক্ষেপে আমরা এক্ষণে বর্ণনা করিব।

বিশ্ব সৃষ্টি—কি করিয়া হইল?— কর্ত্তা—সর্ব্বশক্তিমান অচিন্তনীয় স্বরূপ একমাত্র সৎ—চিৎ ও জ্ঞানের স্বরূপ বিরাট চেতন বা ব্রহ্ম। তাঁহার ইচ্ছাই এই বিশ্বসৃষ্টির আদি কারণ। ইচ্ছা ব্যতীত যেমন কোন কার্য্য হয় না, তদ্রূপ শক্তি ব্যতীত কোন কার্য্য হয় না। গৃহস্থের গৃহিণীর মত ব্রহ্মের একটী শক্তি আছেন, ইনিই ব্রহ্মের গৃহিণী, ইঁহার নাম প্রকৃতি, সামর্থ্য, অনন্ত ও বিচিত্র, ইনি না পারেন এমন কোন কর্ম্মই নাই, এজন্য শাস্ত্রকারগণ বলেন —ইনি, অঘটন-ঘটন পটীয়সী। কোন লোককে সংসার পাতাইয়া পুত্র-কন্যা আত্মীয় স্বজনকে লইয়া ঘর পাতাইতে হইলে যেমন বিবাহ করিয়া গৃহিণী লইতে হয়, তেমনই বিশ্বকর্ত্তা যখন বিশ্বসংসার পাতিয়া ঘর-কন্না করিবার ইচ্ছা করেন, তখন তিনি প্রকৃতির সহিত মিলিত হন। এ মিলন একতরফা হইলে হয় না, দুই জনেরই একই উদ্দেশ্যে মিলন হওয়া চাই। যেমন কেবল পুরুষে বা কেবল মেয়েতে সন্তান হয় না, অপিচ পুরুষ বা মেয়ে না হইলেও সন্তান হয় না, তদ্রূপ এই প্রকৃতি-পুরুষের পরস্পর মিলন না হইলে বিশ্বসৃষ্টি হয় না। এইজন্য যখনই সৃষ্টিকাল উপস্থিত হয়, তখনই প্রকৃতি-পুরুষের মিলন হইয়া থাকে।

এই প্রকৃতি পুরুষের স্বরূপ কি? পুরুষ একটা বিরাট্ চৈতন্যময় সূক্ষ্ম ও জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ। ইহার জ্যোতিঃ বা চৈতন্য জগতের যাবতীয় পদার্থের মধ্যে অবস্থান করিতেছে। পদার্থের উৎকর্ষ ও অপকর্ষানুসারে কোথাও সেই চৈতন্য কোথাও প্রকট এবং কোথাও অপ্রকট অবস্থায় থাকে। সিংহ প্রসুপ্ত অবস্থায় থাকিলেও যেমন তাহার ভিতর শক্তি ও পরাক্রম যথাযথ রূপে অবস্থান করে এবং তখন যেমন কেহ মনে করে না—সিংহের কোন শক্তি নাই, তদ্রূপ উৎকট জড়ের ভিতরও সেই চৈতন্য প্রসুপ্ত অবস্থায় অবস্থান করে বলিয়া পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। তাহা ছাড়া পুরুষ আনন্দময়, জ্ঞানময়, ও নিত্য অর্থাৎ ইহার কখনও বিনাশ নাই। এইজন্য যে সকল পদার্থের মধ্যে চেতন প্রকট, সেই সকল পদার্থই নিজের আনন্দের ইষ্টানিষ্ট জ্ঞানের ও অস্তিত্বের পরিচয় দিয়া থাকে। ঐ সকল পরিচয় দেখিয়া পণ্ডিতগণ বলেন—পদার্থ মাত্রেরই অভ্যন্তরে সচ্চিদানন্দ পরম পুরুষ সর্ব্বদা বিরাজমান আছেন। অপিচ এই পরম বা বিরাট চৈতন্যের কোন গুণ নাই। সেই জন্য যাহার সঙ্গে মিলিত হন, তাঁহারই গুণ প্রাপ্ত হয়েন। যেমন একটা বাঁশীর মধ্যে যদি ফু দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই ফুৎকারের হাওয়া বাঁশীর যে ছিদ্র দিয়া বাহির হইবে, সেই ছিদ্রের অনুরূপ—সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি প্রভৃতি স্বরের স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে। বস্তুতঃ ফুৎকারের হাওয়ার কোন স্বর নাই এবং সে স্বরের কোন রূপও নাই। অথবা যেমন একটা মনুষ্য বা অন্য কোন জীবের ভিতর চৈতন্যময় পুরুষ বা একটা শক্তি অবস্থান করে,—সেই শক্তি যখন চক্ষুতে আসিয়া প্রকটিত হয়, তখন দর্শন ক্রিয়া, কর্ণেতে আসিয়া প্রকটিত হইলে শ্রবণ ক্রিয়া, নাসিকাতে আসিয়া প্রকটিত হইলে ঘ্রাণক্রিয়া, জিহ্বায় আসিয়া

প্রকটিত হইলে আস্বাদন ক্রিয়া এবং ত্বকে আসিয়া প্রকটিত হইলে স্পর্শনক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে। চক্ষুরাদি পাঁচটা ইন্দ্রিয়ে আসিয়া যে পাঁচ প্রকার জ্ঞানের সম্পাদন করে, সে শক্তি একটা মাত্র। কেবল পাঁচটা জায়গায় আসিয়া পাঁচটা স্থানের বৈচিত্র্য বশতঃ শক্তিও পাঁচ রকমের হইয়া যায়। বস্তুতঃ শক্তির কোন ভেদ নাই। এই রকম যে শক্তি হাতে আসিয়া কাজ করে, সেই শক্তি পায়ে গিয়াও কাজ করে—উভয়ে একই শক্তি, অপিচ যে শক্তি গমন কার্য্য করায়, সেই শক্তিই প্রত্যাগমন কার্য্য করায় এবং যে শক্তি হাতে গিয়া দান করে, সেই শক্তিই আবার সেই হাতেই গ্রহণ করিয়া থাকে। গমন আগমন, দান, গ্রহণ, দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শন প্রভৃতি জীবের যাবতীয় শক্তিই একমাত্র শক্তি, ইনিই চেতন, ইনিই পুরুষ ও ইনিই আত্মা। ইঁহার কোন গুণ নাই বলিয়া ইহাতে সকল গুণ আছে এবং ইনি কোন শক্তি হীনও বটেন, অপিচ সর্ব্বশক্তিমান্‌ও বটেন। এখন—প্রকৃতির স্বরূপ কি?—তিন খাই সূতা যেমন একত্র পাক দিয়া একখাই সূতা করিতে পারা যায়, উহা দেখিতে একগাছি সূতাই বটে, কিন্তু উহার ভিতর তিন খাই সূতা থাকে এবং উহাতে তিনখাই সূতার যাবতীয় শক্তিতো থাকেই, অধিকন্তু তিনখাই সূতা মিলিত হওয়ায় অধিকতর শক্তি প্রকাশ পায়। এইরূপ প্রকৃতিও ত্রিগুণময়ী অর্থাৎ একই প্রকৃতিতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ সর্ব্বদা সমানভাবে মিলিত হইয়া অবস্থান করিতেছে। সত্ত্বের গুণ প্রকাশ জ্ঞান ও সুখের হেতু। রজের গুণ ইচ্ছা, দ্বেষ, কর্ম্মশক্তি ও দুঃখের হেতু এবং তমের গুণ জড়তা, মোহ, গ্লানি, আবরকতা প্রভৃতি। সুতরাং একই প্রকৃতিতে বুদ্ধি, নির্বুদ্ধি, জ্ঞান, অজ্ঞান, সুখ, অসুখ, দুঃখ, প্রকাশ, আবরণ, বিবেক, মোহ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও কর্ম্মশক্তি প্রভৃতি যাবতীয় গুণ সকল অবস্থান করে এবং যখন ঐ সত্ত্ব-রজস্তমোময়ী প্রকৃতির গুণত্রয়ের মধ্যে বৈষম্য বা বিক্ষোভ উপস্থিত হয়, তখন তাহাতে যে গুণের আধিক্য হয়, তাহার স্বরূপ প্রবল হয় ও যে গুণের হ্রাস হয় তাহার স্বরূপের ন্যূনতা ঘটে। এইজন্য যে পুরুষের প্রকৃতিতে সত্ত্বগুণের আধিক্য ঘটে, তাহার জ্ঞান, বিজ্ঞান, আনন্দ, দয়া পরোপকার প্রভৃতি অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়, এইরূপ রজস্তমো গুণের আধিক্যে ঐ সকল গুণের কর্ম্ম সকলও অধিক পরিমাণে ঘটিয়া থাকে। এই প্রকৃতির আরও একটী স্বরূপ আছে,—ইনি জড় অর্থাৎ ইঁহাতে চৈতন্যের লেশ মাত্র নাই। তথাপি ইনি জগৎকর্ত্রী বা বিশ্বজননী। যাঁহার কোন শক্তি নাই, কোন চৈতন্য নাই, তিনি কি করিয়া জগৎ গড়িয়া তুলিতে পারেন, আর কি করিয়াই বা বিশ্বের যাবতীয় পদার্থকে প্রসব করিতে পারেন? বন্দুক বা তরবারী জড় পদার্থ, অথচ ইহারা জীবহত্যা করিতে পারে, যদি কোন মনুষ্যের সহিত মিলিত হয় ও সে যদি বন্দুক বা তরবারী প্রয়োগ করে। এইরূপ প্রকৃতি জড় হইলেও যদি উহা চৈতন্যময় পরম পুরুষের সহিত মিলিত হয়। এইজন্যই ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন,—"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতি সূয়তেঃ সচরাচরম।" অর্থাৎ আমার সঙ্গে সঙ্গ করিয়াই প্রকৃতি এই জগতের যাবতীয় চেতন অচেতন পদার্থকে প্রসব করিয়াছে।

যাহার রূপের সীমা,—অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিলেও আজও যাহার অন্ত হইল না, তাহার স্বরূপকে দুই কথায় বলিতে পারা যায়? সামান্য যে মানুষের মুখের ছবি কোন্ অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, কত লোক জন্মগ্রহণ করিল, কতলোক মৃত্যুর কোলে বিশ্রাম লাভ করিল, অথচ আজ পর্য্যন্ত কখনও দেখিলাম না—ঠিক নিখুঁত এক রকম মুখ দুজনের হইয়াছে। যে প্রকৃতির এত বড় বিচিত্র লীলা, তাহার স্বরূপ বর্ণনা সম্ভবপর নহে, তথাপি তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ প্রকৃতির স্বরূপ বর্ণনা করিতে যাহা চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ মাত্র করিতেছি,—

প্রকৃতি—সকল ভূতের কারণ অর্থাৎ জগতে যে সকল পদার্থ আছে, তাহাদের কারণ বা উপাদান ক্ষিতি প্রভৃতি

পাঁচটা ভূত, সেই ভূতের আবার কারণ প্রকৃতি, কিন্তু প্রকৃতির আর কোন কারণ বা উপাদান নাই। তিনিই জগৎ সৃষ্টির আদি কারণ। সত্বরজস্তমোময় ইহার স্বরূপ। এই স্বরূপের অবগতি প্রকৃতির কার্য্য দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, নতুবা কিছুই বুঝিতে পারা যায় না,—এই জন্য প্রকৃতির অপর নাম অব্যক্ত। এই প্রকৃতি যখন নিজের রূপ প্রকটিত করে, তখন আট প্রকারে ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায়, এজন্য ইহার অপর নাম অষ্টরূপা। সেই আট প্রকার রূপ যথা, অব্যক্ত, মহান, অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র।

প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের কয়েকটী বিষয়ে ঐক্য আছে এবং কয়েকটী বিষয়ে অনৈক্য আছে। যে যে বিষয়ে ঐক্য আছে তাহা বর্ণিত হইতেছে। যথা প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ে অনাদি অর্থাৎ ইহাদের আদি নাই এবং ইহাদের অন্তও নাই। উভয়েই নিত্য অর্থাৎ কোন কালেই বিনাশ নাই, অপিচ উভয়েই সর্ব্বগত অর্থাৎ জগতের যাবতীয় চেতন অচেতন পদার্থের অভ্যন্তরে ঐ দুই পদার্থ নিয়ত অবস্থান করিতেছে অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষ ছাড়া জগতে কোন পদার্থই থাকিতে পারে না।

একের (প্রকৃতির) সহিত অপরের (পুরুষের) ঐক্য নাই—এমন কতকগুলি ধর্ম্ম বা গুণ প্রকৃতি-পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান আছে। যেমন প্রকৃতির চৈতন্য নাই, সে জড়। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী, প্রকৃতি সকল পদার্থেরই বীজ স্বরূপা অর্থাৎ জগতের যাবতীয় পদার্থই প্রকৃতি হইতে জন্মিয়াছে। এজন্য প্রকৃতির প্রসব করিবার ক্ষমতা আছে। অপিচ প্রকৃতির সুখ দুঃখ অনুভব করিবার ক্ষমতা আছে। সে কখনই পুরুষের মত সুখ দুঃখে উদাসীন থাকিতে পারে না। পুরুষের আবার এই সকলের ঠিক বিপরীত গুণ সকল আছে, যেমন,—পুরুষ চৈতন্যময় ও ইহার কোন গুণ নাই এবং পুরুষের প্রসব করিবার ক্ষমতাও নাই। তদ্ভিন্ন পুরুষ সুখ-দুঃখে উদাসীন।

জগতে যাবতীয় স্থাবর-জঙ্গম পদার্থ—সমস্তই ঐ পুরুষ প্রকৃতির মিলনে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং সকল পদার্থে উক্ত পুরুষ ও প্রকৃতির গুণ ও ধর্ম্ম সকল বিদ্যমান আছে।

প্রকৃতি ও পুরুষের গুণের তারতম্যানুসারে জগতের পদার্থ সকল বহুভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে যে সকল পদার্থে প্রকৃতির আধিক্য, তাহারা চেতন পদার্থ বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ কোন পদার্থই কেবল জড় বা কেবল চেতন নহে, যেহেতু উহারা উভয়ের সংমিশ্রণেজাত।

জড় পদার্থ ব্যতীত চেতন পদার্থ সকলকে আমরা সাধারণতঃ চৈতন্যের অভিব্যক্তি অনুসারে ৪ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকি। শাস্ত্রকারগণ কিন্তু চেতন পদার্থ সকলের উৎপত্তি ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য অনুসারে বিভাগ করিয়া থাকেন।

জড়ের মধ্যেও চেতন আছে, কিন্তু সে চেতনের দৃষ্টিতে চৈতন্য প্রসুপ্ত অবস্থায় অবস্থান করিতেছে, সাধারণ দৃষ্টিতে উহারবিকাশ বা ক্রিয়া উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। সেজন্য লোকে উহাকে জড়পদার্থই বলিয়া থাকে।

চেতন পদার্থের মধ্যে জড়ের প্রাধান্য কম, চেতনের প্রাধান্যই বেশী: যে পদার্থ যত অধিক পরিমাণে জড় ভাব ত্যাগ করে, সে ততই পরিমাণে পূর্ণ চৈতন্যের নৈকট্য লাভ করিতে থাকে। পূর্ণ চৈতন্যই ব্রহ্ম ভগবান্ ঈশ্বর বা ঠাকুর। সুতরাং জীবের ভগবৎ প্রাপ্তি অর্থাৎ পূর্ণ চৈতন্য লাভ করা। চেতনের স্বভাব সুখদুঃখে উদাসীন হওয়া ও সদা আনন্দে থাকা, অপিচ সে আনন্দ কোন জিনিষ অবলম্বন করিয়া নয়, নিজেতে নিজে আনন্দিত হওয়া, এইজন্য যে জীবে যত চৈতন্য প্রাধান্য, সে জীব তত অধিক পরিমাণে ব্রহ্ম চৈতন্যের সামীপ্য লাভ করে এবং সে জীব তত অধিক পরিমাণ সুখদুঃখ হইতে নিজেকে পৃথক অর্থাৎ উদাসীন থাকিতে পারে ও সদা আত্মানন্দে নিমগ্ন হয় এবং যে জীবে যত জড়ের প্রাধান্য বেশী, সে তত অধিক পরিমাণে জড়ভাবের দিকে অভিমুখীন হয়, সুতরাং সে ততই পরিমাণে সুখদুঃখ অভিভূত ও নিরানন্দ হইয়া থাকে। জড় পদার্থে যেমন

জড় ধর্ম্ম অধিক এবং চেতন পদার্থে যেমন চেতন ধর্ম্ম অধিক, তেমনি সকল চেতন পদার্থের মধ্যেও পুরুষ ও প্রকৃতির গুণেরও ন্যূনাধিক্য ঘটিয়া থাকে। তন্মধ্যে ৪ প্রকার চেতন পদার্থেই, যেসকল পদার্থে পুরুষের গুণের আধিক্য ঘটে, তাহারা পুরুষ এবং যে সকল পদার্থে প্রকৃতির গুণের অধিক্য ঘটে, তাহারা স্ত্রী হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং উভয়ের গুণ তুল্য হইলে তাহা না পুরুষ না স্ত্রী অর্থাৎ ক্লীব।

পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনে বিশ্বসৃষ্টি। সুতরাং জগতের সমস্ত পদার্থেই পুরুষ ও প্রকৃতি যুগলরূপে অবস্থান করিতেছে। ইহাই সচরাচর পদার্থনিচয়ের অন্তর্নিহিত-রহস্য, ইহারই নাম সূক্ষ্মসৃষ্টি।

দোষ সিদ্ধান্ত

(কবিরাজ শ্রীদ্বারকানাথ তর্কতীর্থ)

দোষের গতি নিরূপণ

অনন্তর শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট দোষের গতি নির্ণয় করা হইতেছে। দোষের ক্ষয়, সাম্য ও বৃদ্ধি—এই তিন প্রকারের অবস্থাকে তিন প্রকার গতি বলে। আবার ঊর্দ্ধদিকে গমন, নিম্নদিকে গমন ও চতুর্দ্দিকে বক্রভাবে গমন করাকেও দোষের অন্যবিধ তিন প্রকার গতি বলা যায়।

আমাশয়, পক্বাশয়াদি কোষ্ঠদেশ, রসরক্তাদি শাখাদেশ, মর্ম্ম ও অস্থিসন্ধি স্থানে দোষের সঞ্চলনকেও দোষের গতি কহে।

দোষের এই সকল বিভিন্ন বিভিন্ন গতি বা অবস্থার বিজ্ঞান হইলে সেই সেই অবস্থায় কিরূপ বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকারের চিকিৎসা-পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা বিশেষরূপে নির্ণয় করিতে পারা যায়। যেমন—বায়ু, পিত্ত ও কফের হ্রাস হইলে উপযুক্ত চিকিৎসা দ্বারা তাহাদের ক্ষয় পূরণ করিতে হইবে, আর উহাদের বৃদ্ধি হইলে হ্রাস করিয়া সমতা সম্পাদন করিতে হইবে এবং উহাদের যাহাতে সাম্যভাব রক্ষিত হয়—তদ্বিষয়ে যত্নশীল হইতে হইবে।

দোষের ঊর্দ্ধাদি গতিতে চিকিৎসা প্রক্রম

দোষ যদি কুপিত হইয়া রক্তপিত্ত রোগ উৎপাদন করে, সে সময়ে দোষের গতি যদি ঊর্দ্ধদিকে থাকে, তবে মুখ, নাসিকা প্রভৃতি ঊর্দ্ধপথে রক্তপিত্ত নিঃসৃত হয়। আর যদি নিম্নদিকে দোষের গতি হয়, তবে গুহ্য, মূত্রমার্গ প্রভৃতি নিম্নপথ দিয়া রক্তপিত্ত নির্গত হয়। ঊর্দ্ধগমনশীল দোষে বিরেচন ও অধোগমনশীল দোষে বমন ক্রিয়া কর্ত্তব্য। জ্বর ও সর্ব্বাঙ্গ বাতাদি রোগে দোষের তির্য্যক্ বা বক্রগতি (আঁকাবাঁকা) হয়। ঐ সকল রোগে শাস্ত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে তথাকথিত চিকিৎসা করিতে হইবে।

কোষ্ঠ গতি

দোষ আমাশয়, পক্বাশয় প্রভৃতি কোষে গমন করিলে তাহারও বিশেষ ব্যবস্থা আছে, যথা—বায়ু যদি আমাশয়ে গমন করিয়া রোগ জন্মায়, তবে সেস্থলে আমাশয় কফের স্থান বলিয়া কেবল বায়ুনাশক স্নেহদ্রব্য তৈলাদি প্রয়োগ না করিয়া প্রধানভাবে রুক্ষ দ্রব্যদ্বারা স্বেদ প্রদান কর্ত্তব্য। ঐরূপ পক্বাশয় বায়ুর স্থান; দূষিত কফ যদি সেস্থান আশ্রয় করিয়া রোগ উৎপাদন করে, তবে প্রধানতঃ কফনাশক রুক্ষ স্বেদ না দিয়া সেস্থলে প্রথমে স্নেহপদার্থের দ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া পরে স্বেদ দিতে হইবে।

শাখাগতি

রস, রক্ত প্রভৃতি ধাতুর নাম শাখা। ঐ সমস্ত ধাতুর মধ্যে দোষ রসধাতুকে আশ্রয় করিয়া থাকিলে সন্তত নামক জ্বর জন্মে। রক্ত দূষিত করিয়া দোষ তন্মধ্যে লীন থাকিলে সন্তত জ্বর, মাংসের মধ্যে থাকিলে অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর, মেদঃ-ধাতুকে দুষ্ট করিয়া তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকিলে তৃতীয়ক জ্বর, অস্থি ও মজ্জাকে দূষিত করিলে ভয়ানক, মৃত্যুতুল্য, নানা উপদ্রবযুক্ত চাতুর্থক জ্বর উৎপন্ন হয়। মর্ম্ম ও অস্থিসন্ধিতে দোষের গতি বশতঃ রোগ হইলে সে রোগ কষ্ট সাধ্য হয়, এবং ঐ সকল রোগে কোনরূপ তীব্র ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়া উৎকট চিকিৎসা করিবে না।

অপরবিধ গতি

শীত উষ্ণাদি ঋতু কালে স্বভাবতঃ বায়ু, পিত্ত ও কফের সঞ্চয়, প্রকোপ ও প্রশম হয়, এবং স্ব স্ব যথাযথ নিদান হইতেও সঞ্চয়, প্রকোপ ও প্রশম হইতে পারে। অতএব ঐরূপ ত্রিবিধ অবস্থাকেও গতি বলে।

সুশ্রুতমতে অন্যবিধ গতি

সঞ্চয়, প্রকোপ, প্রসর, স্থানসংশ্রয়, ব্যক্তি ও ভেদ এই কয়েকটী অবস্থাকে গতি বলে।

সঞ্চয়

বায়ু, পিত্ত ও কফের নিজ নিজ স্থানেই ক্রমে ক্রমে যে অল্প অল্প বৃদ্ধি বা আধিক্য জন্মে, উহাকে উহাদের সঞ্চয় বলা যায়। শরীরে দোষের সঞ্চয় হইলে সেই সেই দোষের বিরুদ্ধ বা বিপরীত পদার্থ পাইবার জন্য অভিলাষ হইবে। যেমন পিত্তের সঞ্চয় হইলে পিত্তের বিরোধী ঠাণ্ডা বস্তু ভাল লাগিবে। এবং সেই সেই দোষের যাহাতে বৃদ্ধি জন্মে, সেই সেই নিদান পদার্থ ভাল লাগিবে না। যেমন পিত্তের কারণ উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, ঝাল দ্রব্য ভাল লাগিবে না।

প্রকোপ

বাতাদি দোষের নিজ নিজ স্থানেই যে উদ্বেলভাবে কাঁপ ধরার মত অতিশয় বৃদ্ধি, তাহাকে প্রকোপ বলা যায়। কেহ কেহ বলেন যে, স্বস্থান ছাড়িয়া নানা পথে সঞ্চারকে প্রকোপ বলে।

প্রশম

বৃদ্ধি প্রাপ্ত দোষের পুনর্ব্বার স্বভাব অবস্থায় আসার নাম প্রশম ; দোষের প্রশম হইলে আর রোগ জন্মে না।

প্রসর

বর্দ্ধিত বা প্রকুপিত দোষের নিজ স্থান হইতে ইতস্ততঃ সঞ্চরণের নাম প্রসর। এই প্রসর ১৫ প্রকারের। জলরাশি সঞ্চিত হইয়া অতিশয় বৃদ্ধি হইলে উহা যেমন সেতুকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া অপর জলের সহিত মিলিত হইয়া চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পরে, বাতাদি দোষও সেইরূপ সঞ্চয়ের পর প্রবলভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে কখনও একটী একটী পৃথক্‌ভাবে, অথবা কখনও তিনটীর মধ্যে দুইটীতে মিলিত হইয়া কখনও বা তিনটীই একত্র, কখনও রক্তের সহিত মিলিত হইয়া শরীরের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়ে। যেমন—বায়ু, পিত্ত, কফ ও রক্ত এই চারিটী পৃথক্ পৃথক্‌রূপে ছড়াইয়া পড়ে। এইরূপে প্রত্যেকের স্বতন্ত্রভাবে প্রসরের জন্য চারি প্রকার প্রসর হইল।

বায়ু ও কফ, বায়ু পিত্ত, বায়ু-রক্ত, পিত্ত কফ, পিত্ত-রক্ত ও কফ-রক্ত, এইরূপে উভয়ের যুগপৎ সঞ্চরণ ঘটে, এইরূপ সঞ্চরণে ছয় প্রকার প্রসর হইল।

বায়ু, পিত্ত ও রক্ত, বায়ু পিত্ত ও কফ, পিত্ত, কফ ও রক্ত, বায়ু, পিত্ত ও রক্ত এবং বায়ু, পিত্ত, কফ ও রক্ত এই সকলে এক সময়ে কুপিত হইয়া শরীরে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, এইরূপে পাচ প্রকার প্রসর। সর্ব্বসমেত ১৫ প্রকার প্রসর হইল।

সুশ্রুতের মত অবলম্বন করিয়া উক্ত ১৫ প্রকারের ভেদ কথিত হইয়াছে। বায়ু, পিত্ত এবং কফের ন্যায় সুশ্রুত রক্তেরও দোষত্ব স্বীকার করিয়াছেন। যে হেতু সুশ্রুত-সংহিতা শল্যতন্ত্রার্গত, সেইহেতু শল্যতন্ত্রে ব্রণরোগেরই প্রধানভাবে বর্ণনা আছে। ব্রণরোগে আবার দুষ্যপদার্থ,

সমুদয়ের মধ্যে রক্তই অধিক দূষিত হয় বলিয়া প্রধানভাবে অবলম্বিত হয়। বাতাদি দোষের দ্বারা দূষিত ঐ রক্তও রোগোৎপত্তির কারণ হয়। দোষের দ্বারা অতিশয় দূষিত ধাতুরও দোষ নাম অঙ্গীকৃত হইয়াছে, এই নিয়মে রক্তেরও দোষত্ব আরোপিত হইয়াছে। কিন্তু বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিনটীকেই দোষ বলে। রক্তের উপর দোষত্বের আরোপ হইয়াছে বলিয়া রক্তের দোষ নাম মুখ্য নহে, গৌণ। অতএব রক্তকে দোষ বলিয়া স্বীকার না করায় প্রসরের ভেদ সাত প্রকার হইবে।

স্থান সংশ্রয়

সেই সেই রোগের আশ্রয় স্বরূপ শরীরের সেই সেই প্রদেশ প্রাপ্ত হইয়া সেই সেই রোগ জন্মানকে দোষের স্থান সংশ্রয় বলে, যেমন দোষ প্রকুপিত হইয়া যখন উদরদেশ অবলম্বন করে, সেই সময় বিদ্রধি, উদর, গুল্ম প্রভৃতি উদরগত রোগ উৎপাদন করে। বস্তিকে আশ্রয় করিলে মেহ, অশ্মরী, মূত্রাঘাত প্রভৃতি, গুদদেশ আশ্রয় করিলে অর্শ, ভগন্দর প্রভৃতি, পদ অবলম্বন করিলে শ্লীপদ, বাতরক্ত, বাতকণ্টক প্রভৃতি, সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইলে জ্বর, সর্ব্বাঙ্গগত বাত প্রভৃতি; ত্বক্, মাংস ও রক্তে গমন করিলে কুষ্ঠ ও বিসর্প রোগ জন্মায়। এই কয়েকটী মাত্র উদাহরণ প্রদর্শিত হইল। দোষের স্থানসংশ্রয় অবস্থায় রোগের পূর্ব্বরূপ প্রকাশিত হয়।

ব্যক্তি

জ্বর প্রভৃতি রোগের যে অবস্থায় রূপ বাহিরে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়, সেই অবস্থাকে দোষের ব্যক্তি বলে। এই ব্যক্তি অবস্থায় রোগের সম্যক্ জ্ঞান জন্মে।

ভেদ

দোষের যে অবস্থাতে জ্বরাদি রোগ দীর্ঘকাল লাগিয়া থাকে, এবং ব্রণাদি রোগ ফাটিয়া যায় কেহ কেহ সেই অবস্থাকে দোষের ভেদাবস্থা বলেন।

মতান্তরে ভেদনিরূপণ,—পৃথক্ পৃথক্ অবস্থায় অথবা মিলিত অবস্থায় বিশেষ বিশেষ চিহ্নের দ্বারা যে দোষের অংশ স্থির করা—উহাকে দোষের ভেদ বলে। যেমন—বায়ু একাকীই দুষ্ট হইয়াছে, কিন্তু বায়ু তাহার রৌক্ষ্য, শৈত্য, লঘুতাদি সমস্ত গুণাংশের দ্বারা দুষ্ট, অথবা দুইটা বা তিনটি বা একটি অংশের দ্বারা দুষ্ট হইয়াছে, তাহা সেই সেই অংশ দ্বারা কুপিত বায়ুর বিশেষ বিশেষ লক্ষণ দ্বারা ভাগ করিয়া লইতে হয়। এবং দুই দোষের দুষ্টিস্থলেও সেই সেই দোষ জন্য বাহিরে প্রকাশিত লক্ষণের কম ও বেশীভাগ দেখিয়া দুইটী দোষ বা তিনটী দোষের মধ্যে কোন্‌টী বেশী, কোনটী বা কম দুষ্ট হইয়াছে, তাহার স্থির করিতে হয়। এইভাবে দোষের ভাগ করাকে দোষের ভেদ বলে।

"সঞ্চয়াদি অবস্থায় চিকিৎসার সময় নিশ্চয়"।—দোষ যখন সঞ্চিত হয়, তখনই প্রাথমিক চিকিৎসা কর্ত্তব্য। যেহেতু সঞ্চয় সময় দোষ নিঃসারণ করিলে উহা আর পরের প্রকোপাদি অবস্থায় উপনীত হয় না। প্রকোপাবস্থায় দ্বিতীয় চিকিৎসা কাল। প্রসরে তৃতীয়, স্থানসংশ্রয়ে চতুর্থ, ব্যক্তি অবস্থায় পঞ্চম এবং ভেদ অবস্থায় ষষ্ঠ চিকিৎসা কাল। পর পর অবস্থায় দোষ সকল ক্রমশঃ কঠিন হইয়া পড়ে এবং কষ্টসাধ্য হয়।*

* মৎ প্রণীত সংস্কৃত পুস্তক হইতে অনূদিত—লেখক।

স্বাস্থ্যরক্ষার কয়েকটি সহজ উপায়

(কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী)

১। অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া কিছুক্ষণ মুক্তবায়ু সেবন কর্ত্তব্য। এরূপ বায়ুতে যে অক্সিজেন থাকে, তাহা লাভ করার ফলে স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটে।

২। শয্যা হইতে উঠিয়াই চায়ের পেয়ালা লইয়া বসা উচিত নহে। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকের পক্ষে চা তো উপযোগীই নহে, নিতান্ত অভ্যাসের বশে ইহা ছাড়িতে না পারিলেও খালি পেটে ইহা পান করায় বিষবৎ কার্য্য করিয়া থাকে।

৩। দোকানের বা রেষ্টুরেণ্টের চা পান করা আর অঞ্জলী অঞ্জলী বিষ পান করা সমান কথা। দোকানদারেরা একই বাল্তির জলে পান করা সকল পাত্রই ডুবাইয়া লয়; ইহাতে একের সংক্রামক রোগ অন্যের শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে। চা পান করা যাঁহাদের অভ্যাস আছে, স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হইলে তাঁহারা বাড়ীর প্রস্তুত ভিন্ন উহা যেন কদাচ পান না করেন।

৪। ছোলা ভিজা এবং আদার কুচি ও সৈন্ধবলবণ প্রাতঃকালে সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হয় এবং তাহার ফলে কোন প্রকার রোগ হইতে পারে না। সকালে এবং বিকালে অন্ত খাবার না খাইয়া মুড়ি, নারিকেলের লাড়ু, নারিকেলের সন্দেশ প্রভৃতি খাইলে স্বাস্থ্যবান হওয়া যায়। মুড়ির প্রচলন এক সময়ে আমাদের দেশে খুবই ছিল, এখন সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহা কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহার পুনঃ প্রচলন হইলে দেশের যথেষ্ট উপকার হইবে।

স্নানাহারের সময় নির্দ্দিষ্ট রাখা কর্ত্তব্য। কোন দিন আটটায়, কোনওদিন নয় টায়, কোনও দিন ১০ টায়। আহার করিলে পরিপাকের বিঘ্ন জন্মিয়া থাকে।

আহারের মত স্নানের সময়ও ঠিক রাখিতে হইবে, তাহা ছাড়া কোনও দিন পুষ্করিণীতে, কোনও দিন নদীতে, কোনো দিন কলের জলে, কোনো দিন কুয়ার জলে স্নান করিলে শরীরের পক্ষে উপকার না হইয়া অপকারই হইয়া থাকে।

৬। অপরিষ্কৃত জলে বা যে জল দূষিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে, সেরূপ জলে স্নান করিলে রোগভোগ অনিবার্য্য।

আহারের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা কর্ত্তব্য। আহারও অতি ধীরে ধীরে ভালরূপ চর্ব্বণ করিয়া করাও কর্ত্তব্য অনেকে কার্য্যের খাতিরে যে নাকে মুখে গুঁজিয়া তাড়াতাড়ি আহার করিয়া থাকেন, তাহার ফলেই রোগ ভোগ করিতে বাধ্য হন। ধীরে ধীরে আহার করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলে ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইবার পক্ষে কোনও ব্যাঘাত ঘটে না।

৮। স্নানের সময় ভাল করিয়া তৈল মর্দ্দন করা কর্ত্তব্য। তৈল মর্দ্দনে আমাদের লোমকূপগুলি পরিষ্কার হয় এবং লোমকূপ দিয়া শরীরের মধ্যে উহা প্রবেশ করায় শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। গায়ে সরিষার তৈল মর্দ্দন করাই ভাল। সরিষার তৈল মর্দ্দনে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের মতে নানারূপ রোগেরই যে মূল কারণ বীজাণু, সেই বীজাণুগুলি নষ্ট হইয়া থাকে।

৯। অধিক পান চর্ব্বণ করা দাঁতের পক্ষে তো অনিষ্টকরই, তা'ছাড়া অধিক পান চিবাইলে পরিপাকেরও বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে।

১০। স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে সকল প্রকার মাদক দ্রব্যই বিষবৎ বর্জ্জন করিতে হইবে। একদিন মাদক দ্রব্য সেবনে যে বিষ উদরস্থ করা হয়, তাহার ফলে ভোগ এক দিনেই শেষ হয় না।

১১। নিমন্ত্রণ খাওয়া যত কম করা যায়, ততই ভাল।

নিমন্ত্রণে যাইলেও পরিপাক করিবার শক্তিতে যতটা কুলায়, তাহার বেশী আহার করা কর্ত্তব্য নহে। কোনও সংক্রামক পীড়ার সময় নিমন্ত্রণ খাওয়া একেবারেইবর্জ্জন করা উচিত।

১২। দুই বেলাই কিছু কিছু ব্যায়াম করা কর্ত্তব্য। মুগুর ভাঁজা, ডম্বল, ডনফেলা প্রভৃতি ব্যায়ামে শারীরিক পেশীগুলি অধিক পুষ্টিলাভ করে। অন্য ব্যায়ামের সুবিধা না হইলে মুক্তবায়ুতে ভ্রমণ করিলেও ব্যায়ামের কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে।

১৩। দিবা নিদ্রা এবং রাত্রি জাগরণ—দুইটিই স্বাস্থ্য ক্ষয়ের কারণ, কেবলমাত্র গ্রীষ্মকালে দিবাভাগে অল্পক্ষণ নিদ্রা যাওয়া চলিতে পারে।

১৪। মলমূত্রের বেগ ধারণে নানারূপ পীড়া উৎপত্তি নিশ্চিত। হাঁচি, কাসি প্রভৃতির বেগও ধারণ করিতে নাই। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে সকল প্রকার বেগ ধারণেরই নানারূপ কুফলের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

১৫। মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখিবার চেষ্টা করা আবশ্যক মানসিক প্রফুল্লতায় স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটিয়া থাকে, কিন্তু কুসঙ্গ করিয়া বা কুকাজে রত হইয়া মনের প্রফুল্লতা আনয়ন কর্ত্তব্য নহে। তাহাতে অনিষ্ট হইয়া থাকে।

১৬। কুচিন্তায় শরীর ক্ষয় হয়, অতএব স্বাস্থ্যান্বেষী ব্যক্তিগণের পক্ষে উহা একেবারে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

১৭। "লোভে পাপ এবং পাপে মৃত্যু"—এই যে কিম্বদন্তীটি চলিয়া আসিতেছে, ইহার মূল্য খুবই বেশী। অন্যায় কাজ করিলে তাহার ফলভোগ অবশ্যই করিতে হইবে স্বাস্থ্যরক্ষার বিধিনিষেধগুলি এই জন্যই মানিয়া চলা আবশ্যক। যাঁহারা বাল্যে বা যৌবনে কামক্রোধাদি ষড়রিপুর একান্ত দাস হইয়া পড়েন, বার্দ্ধক্যে তাঁহাদের স্বাস্থ্যহানি নিশ্চিতই ঘটিয়া থাকে। এইজন্যই ব্রহ্মচর্য্যের শিক্ষা বাল্যকাল হইতে করিতে হয়। যাঁহারা চিত্তসংযম করিতে পারেন, রোগের যন্ত্রণা তাঁহাদিগকে কদাচিৎ ভোগ করিতে হয়। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য চিত্তসংযমের মত আর কিছুই নাই। শাস্ত্রকারগণ এই চিত্তসংযমেরই নামান্তর করিয়াছেন যোগশিক্ষা। যাঁহারা চিত্তসংযমে অভ্যস্ত হইয়া যোগী হইয়াছেন, নীরোগ ও দীর্ঘজীবন লাভের দ্বার—তাঁহাদের জন্য চিরদিন মুক্ত হইয়া রহিয়াছে।

১৮। কুৎসিত নাটক-নভেল পাঠ করা অপেক্ষা ইতিহাস-পুরাণাদি পাঠে অধিক সময় ব্যয় করা কর্ত্তব্য। নাটক-নবেল পাঠের ফলে চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। ইহা শরীর ক্ষয়ের বিশেষ কারণ। থিয়েটার এবং বায়স্কোপ দেখা সম্বন্ধেও এই উক্তি প্রযুজ্য। ভগবানের রঙ্গভূমি—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে রঙ্গ প্রতিনিয়ত তিনি দেখাইতেছেন, তাহা ছাড়িয়া আর নূতন রঙ্গের অভিনয় দেখিবার প্রবৃত্তি—দমন করাই ভাল।

১৯। একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের পক্ষে প্রত্যহ নিম্নলিখিতরূপ আহার্য্য গ্রহণ কর্ত্তব্য—

চাউল—দেড় পোয়া হইতে সাত ছটাক।
ডাউল—দেড় ছটাক হইতে দুই ছটাক।
মৎস্য—অর্দ্ধপোয়া হইতে আড়াই ছটাক।
ঘৃত, তৈল—দেড় কাঁচ্চা হইতে তিন কাঁচ্চা।
লবণ—এক কাঁচ্চা।
তরকারী—দুই ছটাক।
মসলা—অর্দ্ধ কাচ্চা।
দুগ্ধ—অর্দ্ধসের হইতে তিন পোয়া।

কোন কোন দিন মৎস্য না খাইয়া মাংস খাওয়া কর্ত্তব্য। যাঁহারা মৎস্য বা মাংসাশী নহেন, তাঁহাদের পক্ষে এবং যাঁহারা দাল কম খাইয়া থাকেন, তাঁহাদের জন্য দুগ্ধ আরও বেশী খাইতে হইবে।

২০। একই জিনিষ প্রত্যহ খাওয়া রুচিকর নহে, এজন্য আহারের পরিবর্ত্তিন করা আবশ্যক। প্রত্যহই ফল অধিক করিয়া খাওয়া উচিত। ফলের রসে শরীর যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্ট হইয়া থাকে।

শতায়ুঃ

(শ্রীবিনয়কুমার সান্যাল বি-এ ভাগবতভূষণ)

ঈশ উপনিষদ্ বলিতেছেন যে, মানুষ যাবতীয় বস্তুতে ঈশ্বরের আবাস ধ্যান করিতে করিতে, তাঁহারই প্রদত্ত ভোগ সকল গ্রহণ করিতে করিতে, এবং কাহারও ধনে লোভ না করিতে করিতে শত বৎসর জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করিবে। এইরূপভাবে জীবনযাত্রানির্ব্বাহ করিলে সকলে আনন্দময় হইবে এবং ইহাদ্বারা, কখনও কর্ম্মবন্ধনের উৎপত্তি হইবে না, এবং তাহা হইলে আর ভবভয় থাকিবে না।

ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিয়া ক্ষণভঙ্গুর একটা মাংসপিণ্ডের ভোগই বা কি, আর তাহাকে বাঁচাইয়া রাখার জন্য বৃথা কর্ম্মভোগই বা কেন? আমাদের পরম কল্যাণময়ী শ্রুতি তাই পূর্ব্বোক্তভাবে জীবনের রহস্য বুঝাইয়া দিতেছেন,—অর্থাৎ ভগবানই জীবরূপে ও জগৎরূপে লীলা করিতেছেন, তিনিই এক একটি জীবদেহকে উপলক্ষ্য করিয়া বিষয় ও ইন্দ্রিয়রূপে নানাভাবে যাবতীয় ভোগ্যবস্তু নিজেই সম্ভোগ করিতেছেন,—জীব যেন এই মহা সত্যটি সতত মনে রাখে, যেন ভুলিয়াও সে নিজেকে একটা স্বতন্ত্র কর্ত্তা বা ভোক্তা না মনে করে; তাহা না হইলেই ভববন্ধন, তাহা না হইলেই যত দুঃখ দুর্দ্দশা। জীব যদি তাহার মূলের সহিত সতত যুক্ত থাকে, তাহা হইলেই অমৃতত্ব, তাহা হইলেই জীবন, মরণ প্রভৃতি ব্যাপার সেই এক ভগবানের লীলা ভিন্ন অন্য কোনওরূপে প্রতীত হয় না। এমনি ভাবে যোগযুক্ত হইয়াও শতবর্ষ বাঁচিতে ইচ্ছা করিতে হইবে,—শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্দ্ধক্য, জরা প্রভৃতি সর্ব্বাবস্থায় ভগবানকে দেখিতে দেখিতে, জীবনের পূর্ব্বে ও পরে সর্ব্বকালে এক ভগবদিচ্ছা ভাবিতে ভাবিতে পরমানন্দে বিচরণ করিতে হইবে।

আমি কিসে প্রয়োজনাতীত নানা সুস্বাদু বস্তু ভোজন করিয়া জীর্ণ করিতে পারিব, আমি কিসে নানাভাবে আমার ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারিব, আমি কিসে কামলোভাদি জনিত নানাপ্রকার পীড়া হইতে রক্ষা পাইয়া আবার পূর্ণ উদ্যমে সমস্ত রিপুর সেবা করিতে পারিব ইত্যাদি ব্যাপারের জন্য যে ঔষধাদি প্রয়োজন, তাহাও প ম করুণাময় ভগবান তাঁহার আয়ুর্ব্বেদ-বাণী-দ্বারা ব্যবস্থা করিয়াছেন; ইহার কারণ এই যে, ভ্রান্ত, সত্যপথভ্রষ্ট মানুষ সুস্থভাবে ভোগ্য বস্তু ভোগ করিতে করিতে যদি একদিনও জীবনের সারতত্ত্ব বুঝিবার জন্য ব্যাকুল হয়—যদি একদিনও সে অন্ধকারের রাজ্য হইতে নিজেকে উদ্ধার করিয়া সত্যের সুমঙ্গল জ্যোতির মধ্যে আনয়ন করার চেষ্টা করে।

সাধারণ মানুষের ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানীও বাঁচিতে ইচ্ছা করেন। তবে তাঁহার যে বাঁচিবার ইচ্ছা, তাহার কারণ ভগবানের বেদবাণীরূপ আদেশ। সেই জন্য তিনি যথা বিহিত স্নান, আহার, নিদ্রা প্রভৃতি আচরণ করেন, কোনও রূপ পীড়া হইলে তাহার প্রতীকারের চেষ্টা করেন এবং শ্বাপদাদি হইতে নিজ দেহকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করেন। তিনি ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য বহ্বাড়ম্বরে স্নানাগার নির্ম্মাণ করেন না বা রসনা তৃপ্তির জন্য অপর প্রাণীর প্রাণ হরণ করিয়া নানারূপ ভোজ্য দ্রব্য প্রস্তুতের ব্যবস্থা করেন না বা কামোপভোগের জন্য বহু প্রকার বিলাস দ্রব্যের আয়োজন বা প্রাণবিমোহন প্রমোদাগারের প্রতিষ্ঠা করেন না। তাঁহার স্নান হইতেছে ধর্ম্মার্থ, তাঁহার দেহ-ধারণ হইতেছে ধর্ম্মার্থ, তাঁহার দারপরিগ্রহ হইতেছে ধর্ম্মার্থ। জড়বুদ্ধি মানুষ চাহে শুধু জড়েন্দ্রিয়ের সেবা, আর তাহার ফলে নানাবিধ রোগাদির তাপে তপ্ত হইতে থাকে। ইহাদের মধ্যে যাহাদের অর্থ আছে, তাহারা

কোনও প্রকারে সুখে দুঃখে জীবনটা কাটাইতে পারে; কিন্তু যাহাদের সে ভাগ্য নাই, তাহাদের কেবল দুঃখ, কেবল দুঃখ। তাই আজ জড়বুদ্ধিসম্পন্ন বিদেশীয় ডাক্তারেরা বলেন যে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি দেশধ্বংসকারী রোগের কারণ হইতেছে মূলতঃ অর্থাভাব। তাঁহাদের যেমন দৃষ্টি, তেমনই সিদ্ধান্ত!

আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমরা সনাতন ধর্ম্মের যে মূল ভিত্তি—প্রধান অবলম্বন—তাহা ত্যাগ করিয়া জড়ের মোহে আকৃষ্ট হইতেছি। কিন্তু জড় জীবনের যে মূল ভিত্তি, তাহা কোথায়? পরাধীন জাতি আবার ধনী হইবে কোথা হইতে? তাই আমরা আত্মার প্রবোধ—ভগবৎ সেবা, ভগবৎ পরায়ণতা—পরিত্যাগ করিয়া জড়ের উপাসক হইতে গিয়া জড়দেবতার উপাসনার উপযুক্ত উপকরণের অভাবে মহা প্রত্যবায়গ্রস্ত হইয়া কেবল মৃত্যুর মুখেই বলিরূপে পরিণত হইতেছি। মুসলমানদিগের অধীন হইয়া আমরা এমনটা হই নাই, তাই তাঁহাদের রাজ্যকালে আমাদের ধর্ম্মও ছিল, আয়ুও ছিল। মুসলমানেরা ইংরাজের মত এতটা জড়োপাসক নহেন; তাঁহারা প্রত্যহ পাঁচবার করিয়া ভগবানের শ্রীচরণে মস্তক অবনত করেন, তাঁহাদের শৌচ, আচার, ব্রত, উপবাস সবই আছে, তাই তাঁহাদের রাজত্বকালে আমরা এমন দুর্গতিপ্রাপ্ত হই নাই। তাঁহারা হয়তো দুই একটা মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বা জোর করিয়া কাহাকেও কাহাকেও নিজ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন; কিন্তু ইংরাজের শিক্ষায় ও আদর্শে আমাদের জীবনের সারবস্তুর মধ্যে ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে ঘুণ ধরিয়া গিয়াছে। এ বিষম ক্ষয়রোগের হস্ত হইতে যে কিসে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তাহার কথা কেই বা ভাবিতেছে? বুদ্ধির মধ্যেও যে রোগ প্রবেশ করিয়াছে।

পরিত্রাণের যে উপায়টি আমাদের সকলের হস্তের মধ্যে আছে, আমি সেইটিকে এই মুহূর্ত্তেই অবলম্বন করিতে বলি। কবে স্বরাজ্য আসিবে, সেই স্বরাজ্যটা এখন কি মূর্ত্তিতে দেখা দিবে, কতদিনে এবং কি গতিতে তাহার পূর্ণত্ব হইবে, পূর্ণ স্বরাজ্যের উদয়ের কত দিন পরে আমরা ধনী হইয়া দেশকে নিরাময় করিব, ইত্যাদি বিষয় ভাবিতে ভাবিতে এদিকে যে সব শেষ হইয়া আসিতে চলিল। কলিকাতা ও অন্যান্য নগরে না হয় একটু চাকচিক্য দেখা যায়, কারণ সেখানে যত ধনী লোকেরা বাস করে; কিন্তু সুদূর পল্লীর দৃশ্য দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। স্বরাজ্য আসিয়া দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি হইবার অনেক পূর্ব্বেই যে দেশ শ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে। তাই বলি স্বরাজকে আসিতে দাও, সে আসুক—তাহার যে ভাবে, যে গতিতে ইচ্ছা; কিন্তু তাহার পূর্ব্বে এসো, আমরা সকলে আবার ভগবৎপরায়ণ হই, এসো, আমরা এই দণ্ডেই জড়ের সেবা ত্যাগ করি, এসো আমরা ইন্দ্রিয়-তর্পণের দিকে না গিয়া এইক্ষণেই ভগবানের সেবাব্রত গ্রহণ করি—মায়া মোহের উপাসকগণের কথা অগ্রাহ্য করিয়া শ্রীভগবানের শ্রুতিবাণীর অনুসরণ পূর্ব্বক সুখী হইয়া, আনন্দময় হইয়া, নিরাময় হইয়া শতবর্ষ ধরিয়া ভাগবত-জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করি।

আয়ুর্ব্বেদে প্রাণীজ ভেষজের প্রয়োগ

(কবিরাজ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায় এম-এস-সি)

(২)

অস্থি

হস্তির অস্থি—ভস্ম করিয়া অর্শে প্রলেপ দিবে।

কুক্কুরের স্কন্ধাস্থি ও পার্শ্বাস্থি—ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া অপস্মারে প্রলেপ দিবে।

গর্দ্দভাস্থির ক্ষার—গোরক্তে মিশ্রিত করিয়া শ্বিত্রে প্রলেপ দিবে।—অপস্মারে প্রলেপ দিবে।

চতুষ্পদ জন্তুর অস্থিভস্ম—ব্রণে লোম উঠিবার জন্য প্রয়োগ করিবে।

১টী বা ২টী ক্ষুর বিশিষ্ট পশুর অস্থিভস্ম—ঘৃত ও মধুর সহিত লেপন করিলে কাস, শ্বাস ও হিক্কা প্রশমিত হয়।

শুক্র

মহিষ, বৃষ ও ছাগের শুক্র—বাজীকরণ ঔষধ।

চটক, হংস, কুক্কুট, ময়ূর, শুশুক ও কুম্ভীর—ইহাদের শুক্র, গব্যঘৃত, কিঙ্গের বসা, শূকরের বসা, ষষ্টিক চূর্ণ ও গোধূম চূর্ণ যথোপযুক্ত পরিমাণে, লইয়া পিষ্টকাদি প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করিলে শুক্রের পূর্ণতা হয়।

কুম্ভীরের শুক্রে কুক্কুট মাংস ভাজিয়া খাইলে বাজীকরণ ফল পাওয়া যায়।

কুক্কুট বা চটক অণ্ড—ক্ষতক্ষীণ রোগীর অতি রক্তস্রাব হইলে জলসহ পাক করিয়া খাওয়াইবে।

চটক অণ্ড—জীবনীয়গণের ক্বাথে চটকাণ্ডের তরলাংশ মিশ্রিত করিয়া তদ্দারা ক্ষৌম বস্ত্র খণ্ড প্রলিপ্ত করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। উরঃক্ষত জনিত কাসে ঐ বর্ত্তির ধূম পান করিবে।

কুম্ভীর ও কুক্কুট ডিম্ব—ঘৃতে ভাজিয়া ষষ্টিক চূর্ণ সহ উষ্ণ জলে মর্দ্দন করিয়া পিষ্টকাকৃতি করিবে, এবং সেই পিষ্টক নূতন ঘৃতে ভাজিয়া আহার করিবে। ইহা অত্যন্ত বৃষ্য।

মৎস্য, হংস, ময়ূর বা কুক্কুটের ডিম্ব—জলে সিদ্ধ করিয়া ঘৃতে সন্তলন করিয়া খাইলে বাজীকরণ ফল পাওয়া যায়।

কাঁকড়া, কূর্ম্ম ও কুম্ভীরের ডিম্ব—পিঁপুল ও লবণ সংযোগে ঘৃতে পাক করিয়া খাইবে। ইহা বাজীকরণ।

ছাগলের বা শুশুকের অণ্ড ঐরূপ করিয়া খাইবে।

ছাগলের অণ্ডকোষ—(ক) দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধে তিল সকল ভাবিত করিবে; পরে সেই তিলের পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া শুশুকের বসায় পাক করিয়া খাইবে। ইহা অত্যন্ত বাজীকরণ।

(খ) ঐ অণ্ডকোষ—পিঁপুল ও লবণ সংযুক্ত করিয়া দুগ্ধে ও ঘৃতে পাক করিয়া খাইবে।

গোধার যকৃত—অর্দ্ধপাটিত করিয়া তন্মধ্যে পিপ্পলী নিহিত করিবে। পরে তাহা মৃত্তিকা দ্বারা লিপ্ত করিয়া অগ্নিতে পুটপাক করিবে। সেই স্বিন্ন পিপ্পলী মধুতে মাড়িয়া অঞ্জন দিলে নক্তান্ধ্য (রাতকানা) বিনষ্ট হয়।

ছাগ যকৃৎ—ঐরূপ ভাবে অঞ্জনার্থ প্রয়োগ করিবে।

গোধা বা ছাগের প্লীহা ও যকৃৎ—খণ্ড খণ্ড করিয়া সর্ষপ তৈলে অভ্যক্ত করিয়া শূল্যপক করিবে। পরে তাহা ঘৃত ও তৈল সংযুক্ত করিয়া অঞ্জন দিবে। ইহাতে নক্তান্ধ্য আশু বিনষ্ট হয়।

ময়ূর, কাক, গোধা, সর্প ও কূর্ম্ম—ইহাদের ভস্ম

ইঙ্গুদীয় তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া অপচীতে প্রলেপ দিবে।

কৃষ্ণ সর্প—দগ্ধ করিয়া তাহার কৃষ্ণবর্ণ ভস্ম বহেড়ার তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া শ্বিত্রে প্রলেপ দিবে।

ঐ—সুদগ্ধ করিয়া তাহা শ্বেতবর্ণ ভস্মে পরিণত হইলে যথাবিধি উহার ক্ষার প্রস্তুত করিবে। পরে সেই ক্ষার জল ৪ ভাগ, তৈল ১ভাগ—একত্র করিয়া শ্বিত্রে মালিশ করিবে।

সর্পবিষ—উদর রোগে সমস্ত চিকিৎসা ব্যর্থ হইলে রাজা ও রোগীর আত্মীয় স্বজনের অনুমতি লইয়া সর্পবিষ সেবন করাইবে। সর্প কুপিত হইয়া যে কোন ফলে বিষ ত্যাগ করে, সেই বিষাক্ত ফল উক্ত জঠর রোগীকে খাওয়াইবে।

টিক্‌টিকীর লেজ—ভস্ম করিয়া তৈল ও জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সূর্য্যপক্ব করিবে। ইহা কেশ নাশক।

গো চর্ম্ম ভস্ম—উন্মাদে প্রয়োগ করিবে।

শজারু, পেচক, বিড়াল, শৃগাল, বৃক ও ছাগল—ইহাদের মূত্র, পিত্ত, মল, লোম, নখ ও চর্ম্ম দ্বারা উন্মাদে ধুম প্রয়োগ করিবে।

কুকুরের নখ—ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া অপস্মারে প্রলেপ দিবে।

ছাগলোম, হস্তি নখ ও গোপুচ্ছ লোম—ইহাদের ভস্ম অপস্মারে প্রলেপ দিবে।

নকুল, পেচক, বিড়াল, গৃধ্র, কীটাহি ও কাক—ইহাদের যথাসম্ভব উর্ণ, পক্ষ ও পুরীষ দ্বারা অপস্মারে ধূপ প্রদান করিবে।

ময়ূরের পায়ের নলী, শজারুর কাঁটা এবং বৃহজ্জাতি শজারুর, রোহকের, চাষ পক্ষীর ও কুরব পক্ষীর লোম, ১টী বা ২টী ক্ষুর বিশিষ্ট পশুর শৃঙ্গ, চর্ম্ম, অস্থি ও খুর অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া সমস্ত একত্র বা পৃথক্ পৃথক্ ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিল দারুণ কাস, শ্বাস ও হিক্কা প্রশমিত হয়। কফ না থাকিলে ইহা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে।

কুকুর, গো, অশ্ব, বরাহ ও উষ্ট্র, ইহাদের প্রত্যেকের দন্ত,—কুষ্ঠে প্রলেপ দিবে।

মাংস

মাংসবর্গ দুইভাগে বিভক্ত, যথা—জাঙ্গল অর্থাৎ উচ্চভূমিজাত এবং আনূপ অর্থাৎ জলবহুল নিম্নভূমিজাত। তন্মধ্যে জাঙ্গল ৮ প্রকার :—

জঙ্ঘাল—দীর্ঘজঙ্ঘা বিশিষ্ট, যথা হরিণ।

বিষ্কির—যে পক্ষীগণ চঞ্চু ও চরণদ্বয় দ্বারা আহার বিকীর্ণ করিয়া খায়, যথা কুক্কুট, ময়ূর।

প্রতুদ— যে সকল পক্ষী ঠোক্‌রাইয়া ঠোক্‌রাইয়া খায়, চটক, কপোত।

গুহাশয়—যাহারা গুহায় বাস করে, যথা সিংহ, ব্যাঘ্র।

প্রসহ—যাহারা সহসা বলপূর্ব্বক ভক্ষ্যবস্তু ধরিয়া আহার করে, যথা কাক, শকুনি।

পর্ণমৃগ—যাহারা বৃক্ষে থাকে, যথা বানর, খটাশী।

বিলেশয়—যাহারা গর্ত্তে শয়ন করে, যথা বোড়াসাপ, মূষিক, গোসাপ।

গ্রাম্য—গৃহপালিত জন্তু, যথা গো, অশ্ব, উষ্ট্র, ছাগ।

আনূপবর্গ—৫প্রকার :—

কুলচর—যাহারা নদী প্রভৃতি জলাশয়ের কূলে বিচরণ করে, যথা গজ, মহিষ, শূকর।

প্লব—যাহারা দল বাঁধিয়া জলে প্লবমান অর্থাৎ ভাসিয়া সন্তরণ করে, যথা হংস।

কোশস্থ—যাহারা কোশে অর্থাৎ কঠিন সংপুটে অবস্থিতি করে, যথা শঙ্খ, শম্বুক।

পাদী—পাদবিশিষ্ট, যথা কূর্ম্ম, কুম্ভীর, কাঁকড়া।

মৎস্য—দুই প্রকার নদীজাত ও সমুদ্রজাত।

আগামী বারে আমরা ঔষধরূপে মাংসের ব্যবহারের কথা কিছু বলিব।

চিকিৎসা-সঙ্কট

(ডাঃ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এল, এম, এস)

যেদিন প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হইতে চিকিৎসা করিবার অনুমতি-পত্র পাইলাম, সে দিন মনে হইয়াছিল যে, সমস্যা ত একপ্রকার সমাধান হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবপক্ষে যতই চিকিৎসা করিয়া রোগীকে সুস্থ করিবার সুযোগ আসিতে লাগিল, ততই দেখিলাম যে, পুস্তকগত কণ্ঠস্থ বিধি-নিয়মের সহিত চিকিৎসিতব্যের বিশেষ সম্বন্ধ নাই। ক্রমেই বুঝিতে লাগিলাম যে, যাহা শিখিয়াছি, তাহার সহিত কর্মক্ষেত্রের খুব একটা ঘনিষ্ঠ সত্তা নাই। চিরদিনই আমার বিদ্রোহ-প্রবল-চিত্ত পুরাতনের প্রতি একটা সন্দিগ্ধ কটাক্ষ করিয়া আসিয়াছে। লিপিবদ্ধ বিধিনিয়ম কেন পালনীয় এ বিচার সর্ব্বদাই আমার ক্ষুভিত করিত। প্রায়ই দেখিতাম--এই বিরাটসৃষ্টি—দেহের ব্যাধি-চিকিৎসার নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থার অপেক্ষা করে না এবং এই বিরাট দেহের যে অতি সূক্ষ্ম ব্যবস্থা—তাহা একবার বিকল হইলে সহজে তাহা পূর্ব্ব নিয়মাধীন করা যায় না। এই অভিজ্ঞতা দিনদিন বাড়িতে লাগিল।

যে যে উপায়ে এই বিকল যন্ত্রের অনুগুলি আবার সচেষ্ট হয়—ইহাই সমস্ত চিকিৎসা শাস্ত্রের অনুসন্ধেয় সত্য। সুদীর্ঘকাল এই চিকিৎসা ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া এবং বিভিন্নস্থানে ভিষক-শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতে করিতে এইটুকুই পাইয়াছি যে, আমরা এখনও বহু দূরে। যতদিন না মানব পুনরায় ঋষিযুগে পঁহুছিতেছে, যতদিন না তাহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি এই স্থূল আচরণ ভেদ করিয়া ব্যাধির মূল কারণের সন্ধান পাইতেছে, ততদিন প্রতিদিন নিত্য নূতন সত্যের ছায়া অন্ধের হস্তি দর্শনবৎ আমাদের মুগ্ধ করিতে থাকিবে এবং এই মোহের আবর্ত্তে পড়িয়া আমরা নিত্য নূতন প্রণালীতে ব্যাধির প্রতি বিদ্রূপ-কটাক্ষ হানিতে থাকিব। কিন্তু এই নিত্য নূতন ব্যবস্থা-প্রণালী বহুস্থলে আমাদিগকে যে আবর্ত্তে ফেলিতেছে, তাহাতে আমরা নিজেদের বিচার-বুদ্ধির মর্য্যাদাকে অগ্রাহ্য করণ এবং অভিজ্ঞতাকে তুচ্ছ করিয়া বহুস্থলে একটা কদর্য্য অনুকরণ-প্রিয়তার প্রশ্রয় দিতেছি মাত্র। ইহাই আমাদের "চিকিৎসা-সঙ্কট"। এই সঙ্কট আমাদের দেশে উপস্থিত হইয়া যে ক্ষতি সাধন করিয়াছে, তাহা বহুশতাব্দীও মুছিয়া ফেলিতে পারিবে কি না জানি না।

এই সঙ্কটের বর্ত্তমান আভিজান পাশ্চাত্য দেশ হইতে হইয়াছে সত্য, কিন্তু যুগে যুগে যখনই আর্য্য-সভ্যতা অনার্য্য বিদ্যার প্রভাবে কলুষিত হইয়াছে, তখনই পূর্ব্বপক্ষের বিশিষ্ট মনীষিগণ অনার্য্য চিন্তাধারা স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। এ যুগেও তাহাই ঘটিয়াছে। যখনই পাশ্চাত্য সভ্যতার উজ্জ্বলকান্তি আমাদিগকে মুগ্ধ করিতে সম্ভব হইল, তখনই আমরা তাহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থাই একমাত্র অভ্রান্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে আর বিচারের অপেক্ষা করিলাম না। এই অনুকরণের একটা রহস্য আছে। যাহা অনুকরণীয়, তাহা হয়ত পূর্ব্বপক্ষ বহু পূর্ব্বেই পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু ব্যবধানের দূরত্ব নিবন্ধন অনুকরণীয় ভাব কিছু পরে এ দেশে আসিল এবং উচ্ছিষ্টনিসেবনবৎ কুফল প্রসব করিতে বিরত হইল না।

যে ব্যবস্থা-পদ্ধতি পাশ্চাত্যজগত পরীক্ষা করিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছে, হয়ত তাহাই এদেশে নূতন বেশে চলিতে লাগিল। সঙ্কট এখন ভীষণ—"কাহার এই সঙ্কট"—এই বিচার করিয়া দেখা যাউক।

যদি চিকিৎসক—ব্যবস্থার আবর্ত্তে পড়িয়া নিজে হাবুডুবু খাইতেন, আমি হয়ত বলিতাম—"ঠেকিয়া শিখুন"—কিন্তু ব্যবস্থা বিভ্রাট এমনই বিপজ্জনক যে, চিকিৎসিতের প্রাণ

যখন এই ঘূর্ণপাকে পড়ে, তখন তাহার জীবন সংশয় হয়। রোগীর আত্মীয় স্বজন হয়ত উপযুক্ত হস্তে চিকিৎসার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত আছেন, কিন্তু বস্তুতঃ চিকিৎসার অনিশ্চিত ব্যবস্থায় রোগীর জীবন সংশয় ক্রমশঃ গুরুতর হইতেছে। এই বিচার যখন আমার মনে জাগে, তখনই মনে হয়, চীৎকার করিয়া সমস্ত সতীর্থ বর্গকে জিজ্ঞাসা করি, ওগো, তোমরা কি রোগীর রোগ-নিদান সম্যক বুঝিতে পারিয়াছ? যদিও সমস্ত বুঝিবার বা বুঝাইবার সময় এখনও আসে নাই, কিন্তু যতটুকু বুঝিয়াছ, তাহাতে পরের জীবন লইয়া খেলা করিতে অধিকারী হইয়াছ বলিয়া মনে হয় কি? যদি নিজের বুকে হাত দিয়া একথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হও, তাহা হইলে তোমার একথেলা করা উচিত নহে বলিয়া মনে হয় না কি?

আমাদের পাশ্চাত্য গবেষণা যতই অগ্রসর হইতেছে, ততই বুঝা যাইতেছে যে, এখনও স্থির সত্য বহু দূরে—ঋষিযুগের সিদ্ধান্ত এখনও আমাদের নিকট অর্ব্বাচীন মনে হইতেছে বটে, কিন্তু চিকিৎসার সঙ্কট সময় উপস্থিত যখনই হয়, তখনই আমরা বুঝি যে, যে সিদ্ধান্ত আমরা আশ্রয় করিয়া চলিতেছি, তাহা অভ্রান্ত নহে। যখনই দেখি যে, এক জ্বর রোগীর মস্তকোপরি প্রত্যহ এক মণ বরফ গলান সত্ত্বেও তাহার এক ডিগ্রী উত্তাপও হ্রাস হইতেছেনা, দেখিয়াও চিকিৎসক দিনের পর দিন সেই ব্যবস্থা দিতেছেন, তখনই মনে হইয়াছে যে এই বরফ দিবার ব্যবস্থার কোন হেতু নাই, শুধু একটা ব্যবহার মাত্র। এই ব্যবহার দ্বারা আমরা রোগীর অসুস্থ দেহ হইতে যে পরিমাণ শক্তির অপব্যবহার করি, তাহা যদি রক্ষা করিতাম, তাহা হইলে তাহাকে এই ব্যাধি-যুদ্ধে মহা সহায় হইত—কিন্তু আমার চিকিৎসা তাহার জীবনী শক্তি হ্রাস করিয়া তাহাকে আরও বিপদে ফেলিল। সেইরূপ জ্বরের যে কারণই হউক না কেন, রোগীকে জলে স্নান করান এবং অনেক স্থলে দিনে বহুবার স্নান করাইবার ব্যবস্থা দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত মনে ঘরে যাই বটে, কিন্তু যে জ্বর শ্লেষ্মাজনিত এবং যাহার হেতুই হইতেছে অত্যধিক ঠাণ্ডা লাগা, তাহাতে ক্রমাগত বরফ প্রয়োগ ও স্নানবিধি যে অত্যন্ত অন্যায়—তাহা প্রথমে বুঝিতে না পারিলেও অচিরে স্বীকার করিতে বাধ্য হই। এইরূপ কতকগুলি ঔষধেরও অসংযত ব্যবহার আমরা করিয়া থাকি—যাহা বিচারসিদ্ধ নহে। অপর কতকগুলি সিদ্ধান্তের নিয়মিত নিন্দা করি—যাহা আদৌ সমীচীন নহে। প্রাচ্য আয়ুর্ব্বেদভক্ত প্রতীচ্যের যখন Injection-প্রণালীর আমূল নিন্দা করেন, তখন তিনি যে বিচার বুদ্ধির ব্যবহার না করিয়াই ইহা বলিতেছেন তাহা সত্য। আবার যখন বায়ু পিত্ত কফের কথায় সঙ্কুচিত-নাসিকায় পাশ্চাত্যবাদী আয়ুর্ব্বেদের নিন্দা করেন, তখনই মনে হয়, আমাদের বিদ্যা শুধু অবিদ্যাই দিয়াছে। অতএব এই সঙ্কট মোচনের উপায়—বিচার বুদ্ধির প্রসার। যে বিচার দ্বারা আমরা প্রাচ্য পাশ্চাত্য-ভেদজ্ঞান-পরিশূন্য এক নিরপেক্ষ অনুশীলনে ব্রতী হইয়া এক **মহা আয়ুর্ব্বেদের** সৃষ্টি করিতে পারি সেই বিচারের দিন শীঘ্র আসুক এবং জগতের কল্যাণ সাধিত হউক এই প্রার্থনা আমি নিয়ত করিতেছি।

যতদিন না আমরা নিরপেক্ষ ভাবে এই অনুশীলন করিতে পারিতেছি, ততদিন দুই মহা চিকিৎসা বিদ্যার মধ্যে ব্যবধান অনিবার্য্য। এই ব্যবধান যাহাতে ক্ষীণ তনু হয়, তজ্জন্য এই বাংলার এক মহাপ্রাণ ৺ যামিনীভূষণ রায় এম,এ এম,বি, জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন, এখনও বহু মনীষা সম্পন্ন ব্যক্তি এই ব্রত সাধন করিতেছেন। ইঁহারাই প্রকৃত কল্যাণকারী—ধন্য ইঁহাদের শিক্ষা, সফল ইঁহাদের বিদ্যাভ্যাস। সঙ্কট এখানে পরাস্ত।

রোগ হইলে কয়েকটি কর্ত্তব্য

[শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু বি, এ, কাব্যরত্ন]

অধিকাংশ লোক অসুখ হইলে চিকিৎসকের উপর সমস্ত দায়িত্ব ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকে, যেন তাহাদের নিজেদের কিছুই করিবার নাই। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে রোগী নিজের অবস্থা নিজে বুঝিতে পারিলে আরাম হইবার পথ সহজ হইয়া থাকে। কি খাইলে ভাল থাকে, ঠাণ্ডায় অথবা গরমে রোগের বৃদ্ধি, বায়ু পিত্ত, কফ—কোনটার প্রাবল্য বেশী, কোন্ ঔষুধে কতটা উপকার দেখা গিয়াছে, ইত্যাদি নানা বিষয় নিজে নিজে বুঝিয়া দেখা উচিত, সে সকল কথা ডাক্তার অথবা কবিরাজ অথবা হোমিওপ্যাথ—যিনিই দেখিবেন, তাঁহাকে জানাইতে পারিলে তাঁহার বিশেষ সুবিধা হয়, নহিলে অল্পক্ষণ দেখিয়া সকল ব্যাপার বুঝিয়া উঠা নিতান্ত দৈববল ছাড়া সম্ভব নয়।

মাথা ধরিলে অনেকেই বলিতে পারেন না, কেন ধরিল। রৌদ্র লাগিতে পারে, অতিরিক্ত চিন্তায় হইতে পারে, বদহজমে হইতে পারে, অনিদ্রায় হইতে পারে, ক্রোধবশতঃ হইতে পারে, পড়িলে হইতে পারে, গরমে হইতে পারে, চোখ খারাপ হইলেও হইতে পারে। কোন্ কারণটার সম্ভব বেশী, বলিতে পারিলে ঠিক ঔষধ পড়িতে পারে। তেমনি অম্বল হইলে কি খাইয়া হইল, সেটা বাহির করা প্রয়োজন। নয়ত আন্দাজে ২৪ রকম ঔষধ দিতে হইবে, রোগ সারিতে সময় লাগিয়া যাইবে।

জ্বরের নাড়ী ও বিজ্বরের নাড়ী দেখিতে জানিলে সময় সময় খুব উপকার দেখা যায়। অনেক সময়ই থার্ম্মোমিটার ভুল হয়। নামজাদা কোম্পানীর থার্ম্মোমিটারের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখিয়া অনেকে দিনের পর দিন ৯৯° এ ভোগেন, সহসা হয়ত কোনোদিন ধরা পড়িয়া যায়—আসলে জ্বরপরীক্ষা যন্ত্রই খারাপ। এরকম ঘটনা বহু প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। এরূপস্থলে নাড়ী দেখিতে জানিলে কত উপকার হইত।

আর এক সমস্যা চিকিৎসা সঙ্কট। এক চিকিৎসকের কথায় বিশ্বাস করিয়া থাকা সব সময় নিরাপদ নয়। দীর্ঘদিন কোন রোগ ভোগ করিলে সঙ্গে সঙ্গে অন্য চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ করা উচিত (যাহাকে ডাক্তারী ভাষায় Consultation বলে)। দেখা গেল, পাথরী বলিয়া চিকিৎসা চলিতেছিল, রঞ্জনরশ্মিতে ধরা পড়িল—কোনোকালেই পাথরী হয় নাই। পেটে টিউমার আছে বলিয়া অস্ত্রচিকিৎসার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ, অন্য বিশেষজ্ঞের পরীক্ষায় পুত্রসম্ভাবনা জানা গেল—এ রকম ঘটনা একাধিক জানি। কালাজ্বরকে থাইসিস্, থাইসিস্‌কে ম্যালেরিয়া, ম্যালেরিয়াকে টাইফয়েড মনে করিয়া ভুল চিকিৎসা করা যেন দৈনিন্দিন ঘটনা হইয়া পড়িয়াছে।

চিকিৎসক রোগটা ধরিতে পারিয়াছেন, কি পারেন নাই, তাও রোগীর বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত। অনেক অল্পবয়স্ক চিকিৎসক গুরুগম্ভীরভাবে চিকিৎসা করিয়া যায়, কলেজ হইতে বাহির হইয়া প্রথম পরীক্ষারূপে রোগীকে ব্যবহার করে, সে বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। আবার যখন কোন কোন প্রবীন চিকিৎসকের জীবনমৃত্যু সম্বন্ধে দায়ীত্ববোধের অভাব দেখি, তখন বাস্তবিকই দুঃখ হয়। রোগীকে যথাসম্ভব শীঘ্র রোগমুক্ত করিব, দুর্ভাগ্যের বিষয় এ রকম ধারণা চিকিৎসকদের মধ্যে ক্রমশঃ বিরল হইয়া আসিতেছে। বিশেষ করিয়া কলিকাতা সহরে রোগীরও সময়ের মূল্য আছে, আফিস বা কাজ-কর্ম্ম থাকিতে পারে এমন কথা চিন্তা করিতে প্রায় চিকিৎসককেই দেখা যায় না। রোগীরা একজোট হইয়া সে ত্রুটি সংশোধন করিয়া দিতে পারেন।

রোগ হইলে অনেকে অত্যন্ত মলিনভাবে থাকেন, দাড়ী কামননা, ময়লা কাপড় পরিয়া থাকেন। ইহা অত্যন্ত ভুল। দেহের পরিচ্ছন্নতার সহিত মনের অতি নিকট সম্বন্ধ। হাজার অসুখ হইলেও বেশভূষায় পারিপাট্য থাকিলে মনে স্ফূর্ত্তি ও সাহস থাকে। রোগ সারিবার পক্ষে মনের জোর বড় কম কাজ করে না। মেয়েদেরও অল্প অসুখের সময় পরিষ্কার করিয়া চুল বাঁধিয়া দেওয়া উচিত এবং দুইবেলা নিত্যকার মত কাপড় বদলাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

অসুখ লোকের নিত্য হয়, সহজে সারিয়া ওঠা না ওঠা মানুষের নিজের উপরেই বহুপরিমাণে নির্ভর করে। চিকিৎসকদের মধ্যে যেমন মেডিকেল ক্লাব আছে, আয়ুর্ব্বেদ-সঙ্ঘ আছে, তেমনি রোগ হইলেই পরামর্শ লওয়া যাইতে পারে—এমন একটা রোগী-হিতৈষী-সংসদ্ হওয়ার দরকার হইয়া পড়িয়াছে, নহিলে মফঃস্বলের রোগীগণকে সহরে আসিয়া দিশাহারা হইয়া পড়িতে হয়।

চয়ন

মানুষের উদরে ক্যামেরা প্রবেশ করাইয়া ফটো তোলা—বিজ্ঞান জগতে আজকাল এমন সব অদ্ভুত জিনিষ আবিষ্কৃত হইতেছে—যাহাতে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না।

মানবের উদরের মধ্যে ফটো-ক্যামেরা প্রবেশ করাইয়া ছবি তুলিবার ক্যামেরা আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। দুইজন অষ্ট্রীয়ান-বৈজ্ঞানিক এই ফটো-ক্যামেরার আবিষ্কারক। লণ্ডন-হাঁসপাতালের রোগীদিগের উদরের মধ্যে এই ক্যামেরা ঢুকাইয়া পরীক্ষাও করা হইয়াছে। এই ক্যামেরায় মানুষের উদরের ভিতরের ছবি ২০সেকেণ্ডের মধ্যে ১৬খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্লেটের মধ্যে ২লক্ষ বাতির আলোর তেজযুক্ত একটু বিদ্যুত-চমকের সময়ের মধ্যে তোলা হইবে। রোগীকে এই ক্ষুদ্র ক্যামেরাটি গিলাইয়া দিয়া পরে আলোর রেখা ইহাতে দিতে হইবে। রোগীরা এই ক্যামেরা খুব সহজে গিলিয়া ফেলিতে পারিবে। পাকস্থলীতে ক্যান্‌স্যর প্রভৃতি রোগের ফটো ইহাতে সহজেই তুলিতে পারা যাইবে। এই ক্যামেরার প্রত্যেকটির মূল্য ১৬০ পাউণ্ড।

উদ্ভিদের মধ্যে মারাত্মক বিষ—রয়টারের প্রিটোরিয়া হইতে প্রেরিত এক সংবাদে প্রকাশ, ট্রান্সভালে একপ্রকার উদ্ভিদের মধ্যে এক মারাত্মক বিষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উক্ত বিষের বিশেষত্ব এই যে, উক্ত বিষে যাহার মৃত্যু হইবে, তাহার দেহের কোন অংশে বিষের কোন চিহ্ন পাওয়া যাইবে না। আরও প্রকাশ যে, উক্ত বিষের এক গ্রেণের সহস্রাংশের এক অংশ একজন পূর্ণ বয়স্কের প্রাণ নাশের পক্ষে যথেষ্ট এবং উহা ষ্ট্রিকনিন হইতে ৫ হাজার গুণ মারাত্মক। অনারষ্টার্ন পুর্টপরীক্ষাগারের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এইচ, এইচ গ্রীন আভেনিয়া এই সাংঘাতিক বিষ আবিষ্কার করিয়াছেন এবং তাঁহার মতে পৃথিবীর মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক বিষ।

যক্ষ্মারোগে বায়ু—"পঞ্চপুষ্পে" প্রকাশ, ফ্রান্সের এক হাঁসপাতালে যক্ষ্মারোগীদের জন্য এক প্রকার ঔষধ পূর্ণ বায়ু গ্রহণ করিতে দেওয়া হয়। ঐ দেশের যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা বেশী বলিয়া প্রত্যেক হাঁসপাতালের সম্মুখে অনেকগুলি নল বসান থাকে। এই নলগুলি দিয়া ঔষধপূর্ণ বায়ু আসে। রোগী যখন খুশী—গিয়া নলে মুখ লাগাইলেই বায়ু গ্রহণ করিতে পারে।

পরীক্ষিত টোটকা ও মুষ্টিযোগ

শিরঃপীড়ায়—। মনসা সীজের পাতার রস সহ কৃষ্ণজীরা জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে শিরঃপীড়ায় বিশেষ উপকার হয়। জ্বর রোগের শিরঃপীড়ায় ইহা দ্বারা বেশী ফল হইয়া থাকে। (২) কালজীরা ও দারুচিনি সমান ভাগে লইয়া জলসহ বাটিয়া প্রলেপ দিলেও শিরঃপীড়ার শান্তি হইয়া থাকে। ইহাও জ্বরের শিরঃপীড়ায় বেশী ফলদায়ক। (৩) দারুচিনি, তেজপত্র, শ্বেত সর্ষপ, গোলমরিচ, কালজীরা, মুসব্বর—প্রত্যেক দ্রব্য সমানভাগে লইয়া জল সহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে বহুকালজাত শিরঃ-পীড়া আরোগ্য হইয়া থাকে। (৪) ধুতরা পাতার রসের সহিত রক্ত চন্দন ঘসিয়া কাদার মত হইলে তাহার সহিত একটু আফিং মিশাইয়া ২।৩ বার প্রলেপ দিলে আধকপালে আরোগ্য হইয়া থাকে।

আগুনে পোড়ায়—(১) গোলআলু বাটিয়া প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। (২) মাৎগুড় লেপন করিলে আগুণে পোড়ার যন্ত্রণার আশু শান্তি হয়। (৩) ঘৃতকুমারীর রস, চূণের জল ও নারিকেল তৈল একত্র মিশাইয়া প্রলেপ দিলেও যন্ত্রণার আশু শান্তি হয়। (৪) জ্বালা দীপ শিলে ঘসিয়া ঐ মাটী দ্বারা প্রলেপ দিলে শীঘ্র পোড়া ঘা আরোগ্য হয়।

কাটিয়া গেলে—(১) কোনো স্থান কাটিয়া গেলে বা আঘাত লাগিয়া রক্ত পড়িতে থাকিলে খাণিকটা চিনি লাগাইলে রক্তপড়া সদ্যঃ বন্ধ হয়। (২) দন্তীর কচি পাতার রস দিয়া বাঁধিয়া দিলে ক্ষতস্থান জোড়া লাগে, রক্তস্রাব বন্ধ হয় এবং সেই স্থান পাকিতে পারে না। (৩) টাটকা গোবর বাঁধিয়া রাখিলেও রক্তপাত বন্ধ হয় এবং ক্ষতস্থান জোড়া লাগে।

সাধারণ ফোড়ায়। (১) কদমের পাতার শিরা ফেলিয়া ফোড়ার পরিমাণে ১৪।১৫ থাক করিয়া ফোড়ার উপর এরূপভাবে বাঁধিয়া দিবে—যেন ফোড়ায় চাপ না লাগে। ইহাতে ফোড়া আরোগ্য হয়।(২) পাথর-কুচির পাতা রেড়ির তৈলে—মাখাইয়া আগুনে একটু সেঁকিয়া লইয়া ফোড়ার উপর সমস্ত দিনে ৩।৪ বার বসাইয়া দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায় এবং পূয রক্তাদি নিঃসৃত হইয়া আরোগ্য হইয়া থাকে।

ভীমরুল প্রভৃতি কামড়াইলে—(১) পুঁইশাকের পাতা, হাতীশুঁড়ার পাতা ও কেঁচুনে ঘাস, একত্র করিয়া লাগাইলে যন্ত্রণার শান্তি হয়। (২) পাথুরে কয়লা ঠাণ্ডা জলে ঘসিয়া প্রলেপ দিলেও যন্ত্রণার শান্তি হয়। (৩) ঘেঁটুফুলের রস দিয়া মর্দন করিলেও যন্ত্রণা নিবৃত্তি হয়। ভীমরুল, বোলতা মৌমাছি, প্রভৃতির দংশনে উপরোক্ত যোগগুলি ব্যবস্থেয়।

কফ বসিয়া গেলে—হুইতোলা মিছরি—নেকড়ার পুঁটলি করিয়া খানিকটা জলে ভিজাইয়া আগুনে চড়াইয়া মধুর মত ঘন হইলে নামাইয়া সমস্ত দিন সেবন করিলে বসা শ্লেষ্মা সরল হইয়া উঠিয়া যায়।

দন্তরোগে।—(১) পাঁপড়ি খদির ১ভাগ, তুঁতে পোড়া ১ ভাগ, কাঁচা গুপারির শাঁস পোড়ান ১ ভাগ, হরীতকীর গুঁড়া একভাগ, বহেড়ার গুঁড়া ১ ভাগ ও আমলকীর গুঁড়া ১ ভাগ—এই সমস্ত একত্র মিশাইয়া দন্ত মার্জ্জনা করিলে দন্তরোগ প্রশমিত হয়। (২) পাঁপড়ি খদির এবং তাহার সিকি পরিমাণ কর্পূর মিশাইয়া কাদার মত করিয়া তদ্বারা দাঁত মাজিলে দন্তশূল ও দন্ত বেদনা আরোগ্য হয়। (৩) আকন্দের আটা ও সৈন্ধব লবণ সমানভাগে মিশাইয়া শুকাইয়া তদ্বারা দন্ত মার্জ্জনা করিলে দন্তশূল প্রশমিত হয়। (৪) নাগেশ্বরের মূল ১ভাগ ও আদা একভাগ একত্র মিশাইয়া দন্ত ধাবন করিলে দন্তরোগ প্রশমিত হয়। (৫) বটের কুঁড়ি চিবাইয়া দাঁতের গোড়ার বেদনার স্থানে রাখিলে বেদনা প্রশমিত হয় এবং নড়া দাঁত শক্ত হইয়া থাকে। (৬) সিউলির মূল বাটিয়া দন্তে

লাগাইলে দন্তশূল নিবারিত হয়। (৭) জাতীফুলের পাতা ১ভাগ, পুনর্ণবা ১ভাগ, গজ পিঁপুল ১ভাগ, ভেরেণ্ডার শিকড় ১ভাগ, কুড় ১ভাগ—সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ একত্র করিয়া মুখে ধারণ করিলে দন্ত রোগ আরোগ্য হয় ও দন্ত বজ্রের মত শক্ত হয়।

কোষ্ঠবদ্ধতায়।—(১) ১ তোলা মৌরি বাটা—১ গ্লাস মিছরির সরবতের সহিত পান করিলে কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া থাকে। (২) ঘন দুগ্ধের সহিত ২ তোলা ছানা মিশাইয়া খাইলে ১বার উত্তমরূপ কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া থাকে। (৩) হরীতকীর গুঁড়া, আমলকীর গুড়া, সোনামুখীর গুঁড়া, ও সৈন্ধব লবণ—এই কয়েকটি দ্রব্য ৷/১০ ওজনে লইয়া গরম জলের সহিত রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে সেবন করিলে প্রাতে উত্তমরূপ কোষ্ঠ শুদ্ধি হইয়া থাকে। (৪) হরীতকীর গুঁড়া চারি আনা, সোনামুখীর গুঁড়া চারি আনা, গোলাপ ফুলের দলের গুঁড়া চারি আনা, একত্র মিশাইয়া তাহার চারিভাগের ১ভাগ মিছরির গুঁড়া পুনরায় মিশাইয়া শীতল জলের সহিত রাত্রিতে শয়ন কালে সেবন করিলে প্রাতঃকালে তিনবার ভেদ হইয়া থাকে। (৫) সোনামুখী ৷৹ তোলা, রেউচিনি ৷৹ তোলা, জাঙ্গীহরীতকী ৷৹ তোলা ও সোঁদাল ফলের আঠা আধ তোলা—আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া উহার অর্দ্ধেক ফেলিয়া দিয়া বাকী অর্দ্ধেকটা কিঞ্চিৎ চিনি মিশাইয়া পান করিলে জোলাপের কার্য্য করিয়া থাকে।

অগ্নিমান্দ্যে।—(১) আহারের পূর্ব্বে আদার কুচি—সৈন্ধব লবণ সহ মিশাইয়া নিত্য সেবনে অগ্নিমান্দ্য প্রশমিত হয়। (২) প্রাতঃকালে শুঁঠে গুঁড়া একআনা হইতে দুই আনা পর্য্যন্ত মাত্রায় কিঞ্চিৎ গব্যঘৃতের সহিত মিশাইয়া লেহন করিয়া একটু গরম জল পান করিলে অগ্নিমান্দ্য প্রশমিত হয়। (৩) যদি প্রাতঃকালে অজীর্ণ বোধ হয়, তাহা হইলে হরীতকীর গুঁড়া, শুঁঠের গুঁড়া ও সৈন্ধব লবণের গুঁড়া—প্রত্যেক দ্রব্য একআনা পরিমাণে লইয়া শীতল জলের সহিত সেবনে অজীর্ণ প্রশমিত হয়।

সর্ব্বৌষধি

(অধ্যাপক শ্রীদিগিন্দ্রনাথ কাব্য-ব্যাকরণ জ্যোতিস্তীর্থ)

শাস্ত্রে গ্রহদোষ, নাড়ী নক্ষত্র দোষ, সংক্রান্তি দোষাদিতে সর্ব্বৌষধী-জলে স্নান করিবার বিধি দেখা যায়। শুধু গ্রহদোষাদিতেই বা বলি কেন, দুর্গোৎসবাদি পূজাতেও সর্ব্বৌষধি-জলে প্রতিমার ও বৃষোৎসর্গে বৃষের স্নান করাইতে হয়। এই জলে স্নান করাইলে গ্রহদোষাদি দূরীভূত হয়। গণ্ডদোষ সময়ে জাত শিশুর মঙ্গল কামনায় সর্ব্বৌষধি জলে স্নান করাইবার বিধি দৃষ্ট হয়। সর্ব্বৌষধি বলিতে কি কি জিনিষ আমরা বুঝি এবং এই সর্ব্বৌষধি জলের এত উপকারিতাই বা কেন, সম্প্রতি তাহাই আলোচিত হইতেছে।

শব্দচন্দ্রিকা পাঠে জানা যায়

মুরামাংসী বচাকুষ্ঠং শৈলেয়ং রজনীদ্বয়ং
শঠীচম্পক-মুস্তঞ্চ সর্ব্বৌষধিগণঃ স্মৃতঃ।

মুরা, জটামাংসী, বচ, কুষ্ঠ (কুড়) শৈলেয়, হরিদ্রা, শঠী, চম্পক এবং মুথা—এই সকল দ্রব্যকে সর্ব্বৌষধি বলিয়া থাকে।

কেহ কেহ মুরামাংসী বলিতে কেবল জটামাংসীই গ্রহণ করিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ কেবল মাত্র মুরাই গ্রহণ করিয়া থ কেন। এই বচনে মুরামাংসী এই শব্দে কেবল মাত্র একই জিনিসের বোধ হইবার সম্ভাবনা

থাকিলেও সর্ব্বৌষধী সম্বন্ধে অন্যান্য বচনে দেখা যায়, মুরা ও জটামাংসী এই উভয় দ্রব্যই সর্ব্বৌষধীতে লইতে হয়।

রাজনির্ঘণ্টে উক্ত হইয়াছে—

কুষ্ঠমাংসী হরিদ্রাভির্বচা শৈলেয় চন্দনৈঃ
মুরা চন্দন কর্পূরৈঃ মুস্তঃ সর্ব্বৌষধি স্মৃতঃ।

কুষ্ঠ (কুড়), জটামাংসী, হরিদ্রা, বচ, শৈলেয়, শ্বেতচন্দন, মুরা, রক্তচন্দন, কর্পূর ও মুথা—এই সকল দ্রব্যকে সর্ব্বৌষধি বলে।

পূর্ব্ববচনের সহিত এই বচনের কতিপয় দ্রব্যের বৈষম্য আছে। পূর্ব্ববচনের দারুহরিদ্রা, চম্পক ও শঠী স্থলে চন্দন, রক্তচন্দন, ও কর্পূর ব্যবহৃত হইয়াছে।

বশিষ্ঠ সংহিতা পাঠে জানা যায়—

কুলমাংসী হরিদ্রে দ্বে মুরা শৈলেয়চন্দনং
বচ চম্পক মুস্তাশ্চ সর্ব্বৌষধ্যো দশৈব হি।

কুল (কুড়), জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মুরা শৈলেয়, চন্দন, বচ, চম্পক ও মুথা এই দশটী দ্রব্যই সর্ব্বৌষধি নামে অভিহিত। প্রথম বচনের শঠী স্থানে চন্দন ব্যবহৃত হইয়াছে।

যাঁহারা দ্রব্যগুণ আলোচনা করেন, তাঁহারা জানেন, পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক দ্রব্যই সকলের উপকারী। পৃথক্ পৃথক্ দ্রব্যের গুণাগুণ সংক্ষেপে এই স্থলে বিবৃত হইতেছে।

(১) মুরা—কফ, পিত্ত, শ্বাস, বিষ, দাহ, পিপাসা ভ্রম, মূর্চ্ছা, তৃষা নাশক।

(২) জটামাংসী—সুগন্ধি, কষায়রস কটু, শীতল, স্বাদু, কফ, ভূত, দাহ ও পিত্তনাশী, কান্তি, মেধাশক্তিবর্দ্ধক বলকারক, ত্রিদোষ, রক্তস্রাব, দদ্রু, কুষ্ঠাদি নাশক, অনুলেপনে জ্বর ও রুক্ষতা নাশক।

(৩) বচ—আয়ুর্বর্দ্ধক, বায়ু ও তৃষ্ণানাশক, স্মৃতিশক্তি-বর্দ্ধক, কান্তিকারক জ্বরাতিসারনাশক।

(৪) কুষ্ঠ (কুড়)—বায়ু, শ্বাস, কাস, হিক্কা, জ্বরনাশক, কণ্ডূ, দদ্রু ও কুষ্টাদিনাশক এবং কান্তিকারক।

(৫) শৈলেয়—কণ্ডূয়ণ, কুষ্ঠ, অশ্মরী, দাহ, তৃষ্ণা, বমি, ব্রণ, ও শুহ্য রক্তনাশক।

(৬) হরিদ্রা—কফ, পিত্ত, কণ্ডূ, বাত, ব্রণ, চর্ম্মদোষ, পাণ্ডু, শোথ, অপচী, মেহ, কুষ্ঠ, ব্রণনাশক, দেহের বর্ণ উৎপাদক।

(৭) দারু হরিদ্রা—হরিদ্রার তুল্য গুণ বিশিষ্ট, বিশেষতঃ কর্ণরোগ, চর্ম্মরোগ নাশক।

(৮) শঠী—জ্বর, কফ, কণ্ডূ, ব্রণদোষ ও মুখরোগ নাশক।

(৯) চম্পক (চাঁপাফুল)—তিক্ত ও কটুরস, শীতল, পিত্ত ও কফ নাশক। দাহ, কুষ্ঠ, ব্রণ ও ক্রিমিনাশক।

(১০) মুস্তক (মুথা) তিক্ত ও কটুরস, বায়ু নাশক, মলরোধক, অগ্নিদীপক ও জ্বরনাশক।

উল্লিখিত প্রত্যেক দ্রব্যেরই পৃথক্ পৃথক্ রোগনাশের ক্ষমতা আছে। অনেকে সর্ব্বৌষধি অনুলেপন জন্যও ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই সর্ব্বৌষধি-জলে স্নান করিলে যে বহুবিধ রোগ নাশ হয়, ইহা ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু মাত্রেই বিশ্বাস করিয়া থাকেন। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া ধর্ম্মনীতির ব্যবস্থা দিয়াছেন। ক্রিয়াকলাপের মধ্যে এমন নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এমন ঔষধ সেবন এমন ধাতুধারণ, এমন পূজোকরণ ব্যবস্থা দিয়াছেন এবং আহার বিধির কথা উল্লেখ করিয়াছেন—যাহাতে স্বাস্থ্য রক্ষা হইয়া থাকে। এই সর্ব্বৌষধি স্পর্শ ও অনুলেপন স্বাস্থ্যোন্নতি সহায়ক হয়—ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বোষধি-জলে স্নানের ব্যবস্থা দিয়াছেন। সর্ব্বৌষধি ঔষধরূপে সেবনে কোনরূপ উপকার হইতে পারে কিনা এবং কোন্ রোগেই বা ব্যবহৃত হইতে পারে চিকিৎসকগণ গবেষণা দ্বারা ব্যবস্থা দিলে সাধারণের উপকার হইবে সন্দেহ নাই।

বিবিধ

পরলোকে কবিরাজ যোগীন্দ্রনাথ-সেন।—আমরা গভীর শোক সন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, বৈদ্যরত্ন কবিরাজ যোগীন্দ্রনাথ সেন মহাশয় আর ইহজগতে নাই। গত ১৬ই আষাঢ় বুধবার বেলা ৯টা ২৪মিনিটের সময় তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। কবিরাজ যোগীন্দ্রনাথ চিকিৎসা ক্ষেত্রে কিরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

কবিরাজ যোগীন্দ্রনাথ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ হইতে সংস্কৃত সাহিত্যে এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া "বিদ্যাভূষণ" উপাধিলাভ করেন। ইনি তিন বৎসর কলিকাতা মেডিকেল কলেজেও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার পিতার নিকট সমগ্র আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র শিক্ষা করেন। ইনি নিজ প্রতিভাবলে আয়ুর্ব্বেদে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। স্বাধীন নেপাল ও বাহিরের বহু রাজবাটীতে ইনি বহুবার চিকিৎসার্থ গমন করিয়া যশোলাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় নিখিল ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ মহাসম্মেলনের যে অধিবেশন হয়, ইনি তাহার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন কানপুর ও কলম্বো সহরে নিখিল ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ মহাসম্মেলনে ইনি দুইবার সভাপতি হইয়াছিলেন। ঢাকা জেলা আয়ুর্ব্বেদ সম্মেলনের ও সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে সরকার বাহাদুর ইঁহাকে "বৈদ্যরত্ন" উপাধি প্রদান করেন। কবিরাজ যোগীন্দ্রনাথ "চরক সংহিতার" টীকা লিখিয়া গিয়াছেন। ইহার কয়েক খণ্ড বাহির হইয়াছে, এখনও সম্পূর্ণ খণ্ড বাহির হয় নাই। এই "চরক সংহিতার" টীকাই তাঁহাকে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকদিগের নিকট অমর করিয়া রাখিবে। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে তিনি যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের 'ডিন' মনোনীত হইয়াছিলেন। ইঁহার পরলোক গমনে আয়ুর্ব্বেদের যে ভীষণ ক্ষতি হইল, তাহা বলিবার নহে। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়স ৬২ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। ইঁহার তিন পুত্র ও পাঁচ কন্যা বর্ত্তমান। ইঁহার দুই ভ্রাতা—যতীন্দ্রনাথ ও সুধীন্দ্রনাথ উভয়েই কবিরাজী করেন। আমরা ইঁহার শোক সন্তপ্ত পরিজন বর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

সাহিত্যে স্বাস্থ্যহানি।—বঙ্কিমযুগের পর অনেক উপন্যাসই বাজারে প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠক এবং পাঠিকার সংখ্যাও অনেক, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে যে নির্ম্মল রসধারা ঢালিয়া গিয়াছেন, এখন দুইতিন জন লেখকের গল্প উপন্যাস ব্যতীত অনেক উপন্যাসেই আর তাহা পাওয়া যায় না। ইহা ভিন্ন এখন নবেলে কৃতিত্ব দেখাইবার জন্য যে অস্বাভাবিক ঘটনাবলী ঔপন্যাসকেরা চিত্রিত করিতেছেন, তাহা পড়িয়া দেশবাসীর যেরূপ রুচি বিগ্‌ড়াইয়া যাইতেছে, সেইরূপ তাহার ফলে যে স্বাস্থ্যহানি ও না ঘটিতেছে—এমন নয়। এই শ্রেণীর নভেলগুলি পড়িয়া আমাদের দেশের যুবক যুবতীদিগের মনে যে কুরুচির ছাপ পড়িতেছে, বর্ত্তমান সময়ে পুরুষের শুক্র এবং স্ত্রীলোকের জরায়ু ঘটিত অনেক পীড়া তাহারই ফলসম্ভূত। দেশ হইতে এই আয়ুক্ষয়ের অন্যতম কারণ এইরূপ নভেল পড়া কি করিয়া বন্ধ হইবে—তাহা দেশ রক্ষায় যাঁহারা আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের চিন্তা করা উচিত।

দেশীয় ব্যবসায়ের উন্নতি।

(মঙ্গলবার, ৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩৩৭ ; ইং ২১শে অক্টোবর, ১৯৩০, তারিখের "বঙ্গবাণী" হইতে উদ্ধৃত।)

"বর্ত্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ মানব এবং ভারতবর্ষের কর্ণধার মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জ্জনের ফলে, দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, স্বদেশী জিনিষের প্রতিও জনসাধারণের আদর বাড়িয়াছে। যুগাবতার মহাপুরুষ সত্যপথে থাকিবার জন্য বারংবার উপদেশ দিলেও, কেহ কেহ অর্থলোভে মোহগ্রস্থ হইয়া, সত্যবাণী উপেক্ষা করতঃ নানাপ্রকার অসদুপায়ে ভেজাল বিদেশী জিনিষ খাঁটি স্বদেশী বলিয়া বাজারে চালাইতে চেষ্টা করিতেছেন, দেখা যায়। ঐ সকল অসাধু ব্যবসায়ীগণ দোকানদারদিগকে মোটা মোটা কমিশন দেন। সেই লোভে কতিপয় দোকানদার সরল প্রকৃতির খরিদ্দারগণকে নানাপ্রকার মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া খাঁটি স্বদেশী জিনিষের নামে ভেজাল বিদেশী জিনিষ দিয়া থাকেন। ইহা অতীব দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।

দেশী বার্লী.

উদাহরণ স্বরূপ আজ আমরা বার্লীর কথাই আলোচনা করিব। খাঁটি বার্লী প্রস্তুত করিতে বেশী দামের কলকব্জাদির আবশ্যক বলিয়া, কোন কোন ব্যবসাদার যাবার আটা (Java starch), ক্যাসাভা ময়দা, প্রভৃতি নানাপ্রকার অনিষ্টকর গুঁড়া, বার্লী বলিয়া বাজারে বিক্রয় করিতেছেন। ঐ প্রকারের তথা-কথিত বার্লী ব্যবহারের ফলে দেশে অজীর্ণ ও ডিস্‌পেপসিয়া প্রভৃতি নানাপ্রকারের পেটের অসুখ এবং বেরীবেরী ইত্যাদি রোগ বৃদ্ধি পাইতেছে। আমরা আশা করি যে, কলিকাতা কর্পোরেশন এবং বাঙ্গালা সরকারের স্বাস্থ্য-বিভাগের কর্ত্তাগণ সত্বর এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া একটা প্রতীকারের ব্যবস্থা করিবেন।

জনসাধারণেরও একটা কথা বিশেষ স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। বার্লী শিশুর খাদ্য ও রোগীর পথ্য। আবার সাধারণ স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যও—বিশেষ গরম ধাতের লোকের জন্য—বার্লী জল পানের ব্যবস্থা আজকাল ডাক্তারেরা দিয়া থাকেন। জিনিষ খাঁটি না হইলে সুফলের পরিবর্ত্তে কুফলই ফলিবে। তাই দোকানদারের আশ্বাস সত্ত্বেও অপরিচিত, অবিশ্বাসী ও নূতন ব্যবসাদারের জিনিষ না কিনিয়া, একমাত্র সুপরিচিত ও বিশ্বাসী কোম্পানীর বহুদিনের স্থাপিত কারখানায় প্রস্তুত বার্লীই ক্রয় করা জনসাধারণের উচিত।

কলিকাতার কে, সি, বসু এণ্ড কোং ভারতবর্ষে বার্লী প্রস্তুতের কারখানা সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় ৫০ বৎসর ধরিয়া বার্লী ও বিস্কুটের ব্যবসা করিয়া তাঁহারা বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। তাহাদের বিরাট কারখানায় শুধু বার্লী প্রস্তুতের কলকব্জার মূল্যই তিন চারি লক্ষ টাকা হইবে। **তাঁহারা একমাত্র ভারতবর্ষে উৎপন্ন বস্তু হইতেই বার্লী প্রস্তুত করেন। সুতরাং উহা সর্ব্বপ্রকারে বিশুদ্ধ ও স্বদেশী।**

বিদেশীর সহিত প্রতিযোগিতা

পূর্ব্বে যখন বিলাতী বার্লী বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছিল, তখনও **বসুর দেশীয় বার্লী** উহার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাহার একমাত্র কারণ এই যে **বসুর বার্লী বিদেশী বার্লী হইতে কোনও অংশে হীন নহে।** তখন ভারতবর্ষে বার্লী প্রস্তুতের অপর কোন কারখানা ছিল না। আজ বিদেশী বর্জ্জনের সুযোগে অনেক দেশী কারখানা গজাইয়া উঠিতেছে। তাঁহারা যদি সদুপায়ে থাকিয়া দেশী বার্লী প্রস্তুতের কারখানা করেন, তবে আমাদের আনন্দের বিষয়ই হইত। কিন্তু উহা কঠোর পরিশ্রম, বহুদিনের অভিজ্ঞতা ও বেশী ব্যয় সাধ্য বলিয়া কেহ কেহ অসদুপায় অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া আমরা শুনিয়াছি। বস্তুতঃ দেশী বার্লী প্রস্তুতকারক বলিয়া যে কয়টি কোম্পানীর নাম আজকাল বাজারে শোনা যায়, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা ক্যাসাভা ময়দা বিক্রেতা; কাহারও বা উপযোগী কল কারখানাই নাই। ক্যাসাভা ও বার্লী সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিষ। তাহাদের গুণ ও সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সাগুদানার সহিতই ক্যাসাভা দানা ভেজাল রূপে ব্যবহৃত হয়। তাই কোন ডাক্তারই বার্লীর পরিবর্ত্তে ক্যাসাভা ময়দা ব্যবহার করিতে বলিবেন না

দেশীয় দোকানদারগণের প্রতিও আমাদের অনুরোধ, এই সত্যগ্রহণের দিনে তাঁহারা যেন বেশী লাভের আশায় এবং ধারে পাইয়া যা তা জিনিষ বাজারে চালাইতে চেষ্টা না করেন। কারণ তাহা মহাত্মাজীর আদেশের বিরুদ্ধে। অধিকন্তু মিথ্যা ও ভেজালের কথা একদিন বাহির হইয়া পড়িবেই, তখন ঐ সকল দোকানদারেরও সর্ব্বনাশ হইবে। লোকেরও হয়ত আবার দেশী জিনিষের প্রতি অশ্রদ্ধা আসিবে। তাহাতে দেশের সর্ব্বনাশ হইবে। মহাত্মাজীর আদেশ, নিজের দেশের বস্তুদর্শীতার দ্বারা প্রস্তুত খাঁটি জিনিষ ব্যবহার কর ও বিদেশী বর্জ্জন কর; উহাই স্বরাজ লাভের একমাত্র উপায়। বর্ত্তমান সময়ে কত শত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা, বালক ও বালিকা এবং যুবক ও যুবতী মহাত্মাজীর আদেশে দেশের জন্য নিজেদের সুখ শান্তি বিসর্জ্জন দিয়া কারাবরণ করিতেছেন। ভারতবাসী প্রত্যেক দোকানদারেরও উচিত যে তাঁহারা নিজ নিজ স্বার্থ ত্যাগ করিয়া যাহাতে দেশীয় ব্যবসায়ের উন্নতি হয় এবং প্রতিযোগিতায় বিদেশীর সমকক্ষ হওয়া যায়, তৎপ্রতি লক্ষ রাখা। সস্তায় পাওয়া বা ধারে পাওয়া বিদেশী ভেজাল জিনিষ না চালাইয়া বিশ্বাসী কারখানায় প্রস্তুত অকৃত্রিম দেশী জিনিষ চালানই উহার একমাত্র উপায়। আমরা **কে, সি, বসু এণ্ড কোম্পানীর** উত্তরোত্তর উন্নতির কামনা করি।"

K. C. B. & Co. Shambazar, Calcutta.

সূচী

"আয়ুর্ব্বিজ্ঞান সম্মিলনীর" নিয়মাবলী

"আয়ুর্ব্বিজ্ঞান সম্মিলনীর" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ২৸৵০, প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। আষাঢ়ে বর্ষারম্ভ, বৎসরের যে কোনো সময়ে গ্রাহক হইলে তাঁহাকে আষাঢ় হইতে 'কাগজ' লইতে হইবে।

অপ্রাপ্ত সংখ্যা। "আয়ুর্ব্বিজ্ঞান সম্মিলনী" প্রতি বাংলা মাসের ১ম সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। কোন মাসের কাগজ না পাইলে সেই মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে অপ্রাপ্তি সংবাদ ডাকঘরে খবর লইয়া ডাকবিভাগের উত্তর সহ আমাদের নিকট পৌঁছান আবশ্যক।

পত্রোত্তর। রিপ্লাই কার্ড কিম্বা টিকিট না পাঠাইলে কোন চিঠির জবাব দেওয়া সম্ভব হয় না।

প্রবন্ধাদি। টিকিট বা ঠিকানা লেখা খাম দেওয়া থাকিলে অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয়। রচনা কেন অমনোনীত হইল, তৎসম্বন্ধে সম্পাদক কোনো উত্তর দিতে অসমর্থ।

প্রবন্ধের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

বিজ্ঞাপন—কোন মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, তাহার পূর্ব্বমাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে। অশ্লীল বিজ্ঞাপন ছাপা হয় না। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে তজ্জন্য আমরা দায়ী নহি এবং বিজ্ঞাপন যখন বন্ধ করিবেন, ব্লক থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে ফেরৎ লইবেন। নচেৎ হারাইয়া গেলে আমরা দায়ী নহি। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিজ্ঞাপনের মাসিক মূল্য সাধারণ পৃষ্ঠার জন্য

পূর্ণ পৃষ্ঠা ... ১৬৲। অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম ... ৯৲। সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম ... ৫৲।

কভারে এবং বিশেষ স্থানে বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র।

কার্য্যালয়—২০, বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Printed at Umasankur Press, 12, Gourmohon Mukherjee Street and Published from 20, Boloram Ghosh Street, Calcutta, by Indu Bhushan Sen Ayurvedshastri, L. A. M. S.